KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৩বি, ঘোষ লেন, কলকাতা-৫
Collection : KLMLGK	Publisher : অমিত কুমার বসু
Title : অগ্নিশর অন্তর	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 12 Puja Special	Year of Publication : ১৪০০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : ~~অমিত কুমার~~ ড. জীবেন্দু রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

আলোক আসর

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র দ্বাদশ বর্ষ শারদ সংখ্যা ১৪০০ সন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

□ সূচী □

কবিতা □	অমিতাভ দাশগুপ্ত তরুণ সান্যাল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
	পার্থ রাহা মঞ্জুষ দাশগুপ্ত প্রণব চট্টোপাধ্যায়
	রমেন আচার্য দেবকী ঘোষ বাসুদেব দেব
	প্রত্যুষ প্রসূন ঘোষ পঞ্চানন তুয়ারী গনদেব ভট্টাচার্য
	বাসুদেব দেব উদয় দাশগুপ্ত কুমারেশ চক্রবর্ত্তী
	অনুপ কুমার বসু অমর নাথ ঘোষ ক্ষুদিরাম রাউত
ফিরে পড়া □	অমিয় কুমার বসুর তিনটি মূল্যবান রচনা
কবি ও তার কবিতা □	সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা তত্ত্ব ও জীবন জীবেন্দু রায়
	অশোক বিজয় রাহার আরণ্যকসত্তা শীতল চৌধুরী
বিশেষ নিবন্ধ □	ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অর্ধশতাব্দী ফিরে দেখা
	সুশ্মাত দাশ, সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও ধনতন্ত্রের সংকট
	সুজিত পোদ্দার
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব □	ছায়া দেবী পারমিতা ঘোষ
	সুচিত্রা মিত্র মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য
	উৎপল দত্ত নীহার মজুমদার
	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কানাই পাকরাশী
ছোট গল্প □	অপরাহ্ন গৌর শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	পিঁপড়েরা সমীর কুমার রায়

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকঃ
৺অমিয় কুমার বসু

প্রধান উপদেষ্টা ঃ
ডঃ রমেন্দ্র কুমার পোদ্দার

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ
ডঃ পবিত্র সরকার
ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ
অধ্যাপক অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদক ঃ
ডঃ জীবেন্দু রায়

যুগ্ম সম্পাদক ঃ
অমিত কুমার বসু
উদয় দাশগুপ্ত
সত্যব্রত সাহা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
চারু খান
স্কেচ গনেশ পাইন ঋণ স্বীকার প্রতিক্ষণ

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ঃ
২৩বি, ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬
ফোন ঃ ৫৯-৪২২৩
৩৫০-৭৮৯৬

অমিত কুমার বসু কর্তৃক (২৩বি, ঘোষ লেন, কলি-৬) হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বাসুদেব প্রিন্টিং ওয়ার্কস, নারায়ণতলা রোড, বাগুইআটি, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত। Post No. WBNP/43 RNI 093/81. দাম ঃ দশ টাকা

সম্পাদকীয়—

প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের জীবনের প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বন্যা ভূমিকম্প ধ্বংস বা হিমানী সন্নপাত আমাদের প্রাণহরণ করতে সদাই উদ্যত। কখনও তার থেকে পার পাই কখনও পাই না।

সম্পাদকীয় লেখবার আগে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্পই এ বছরের সবচেয়ে বিধ্বংসী ঘটনা। ত্রিশ বত্রিশ হাজারের কথা কাগজে পড়েছি, বাস্তবত মৃত্যু সংখ্যা আরও বেশী কিনা তা জানবার উপায় এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। সে যাই হোক মুঙ্গেরের মৃত্যুর পর এতবড় দুর্ঘটনা ভারতবর্ষে যে ঘটেনি তা নিশ্চিত। মানুষ হিসেবে প্রতিবেশীর বিপর্যয়ে সমবেদনা তো জানাতেই হবে, সেই সঙ্গে বাড়াতে হবে সাহায্যের হাতও, যতটুকু পারা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ ব্যাপারে বিদেশীরাও এগিয়ে এসেছেন।

এরই মধ্যে এ বছরের শারদোৎসবও সমাসন্ন। জীবন থেমে থাকে না। থেমে নেই আমাদের ছোটো অথচ আদরের পত্রিকাটির কাজও। বিচিত্র বিষয় এবং স্বাদের রচনা সাধ্যমত সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই সংখ্যায়। সুচিত্রা মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, প্রবীণ রবীন্দ্রউত্তর কালের কবির কবিতা বিশ্লেষণ— কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। যাঁরা সময় করে পড়ে উঠতে পারবেন, গুণাগুণ তথা ভালোমন্দ বিচারের দায়িত্ব অবশ্যই তাঁদের।

এটি আমাদের দ্বাদশ পূজা সংখ্যা—প্রসঙ্গত এ কথাটিও সম্পাদক হিসেবে জানিয়ে রাখলাম।

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য
সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয় :—

ক) এইচ, এম, টি,/মহিন্দর/এসকর্টস/মিৎসুবিশি ট্রাকটরস।

খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।

গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।

ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের। তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং : ২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

শারদ শুভেচ্ছা

শিউলি কাশফুল আর মেঘহীন নীল আকাশ দেখলে বোঝা যায় সময়টা এখন শরৎ। শরতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শারদীয় উৎসব।

আমরাও এই উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ এবং প্রতিটি দিনই উৎসবের দিনের মতো গুরুত্ব দিয়ে বাংলার সর্বত্র দিবারাত্রি কাজ করে চলেছেন পর্ষদের প্রতিটি কর্মী।

উৎসবের কাল এবং অন্যান্য স্বাভাবিক দিনগুলির পরিবেশ অটুট রাখার জন্য চাই হুকিং, ট্যাপিং-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরির উৎপাত চিরতরে বিনাশ করা। একাজে আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

মানুষের পাশে দাঁড়াও

অমিতাভ দাশগুপ্ত

হঠাৎ বাবুকী মাথা নাড়ে।
ভেঙে পড়ে সৌধমালা, কুঁড়েঘর,
রক্ত আর শ্রমে গড়া সারি সারি সাধের সংসার।
ইট-কাঠ-কংক্রিটের গণ-কবরের বুক থেকে
ডেকে ওঠে হাজার কংকাল—
মানুষের পাশে এসে মানুষের মতন দাঁড়াও।

ও স্বদেশ ও আমার মা,
কোথায় তোমার ব্যথা
এত দুর্দহনে কেন বারবার জেনে নিতে হয় ?
জলের মতন রক্তপাতে
কেন বুঝে নিতে হয়, আমরা মানুষ নই—
পরস্পর যুযুধান কর্ণ ও অর্জুন !

আজ প্রক্ষালন চাই
নিবিড় প্রাণের পুণ্যে চাই সমবেত প্রক্ষালন,
কাঁধে কাঁধ দাঁড়ালেই হেটমুণ্ডে ফিরে যাবে সমস্ত মরণ,
এসো, আজ আবাদে-আবাদে
আমরা ফোটাই ফুল মৃত্যুর সুতীব্র প্রতিবাদে।

আলোক আসর এক

ভাষার কথা

তরুন সান্যাল

আকাশের ভাষা পড়তে বালক বয়সও গেল, এবং নদীর,
কৈশোরে যা খেলা-খেলা, যৌবনে তা তেতে লাল রক্তে অশ্বক্ষুরে,
মেঘে মেঘে গ্রামদেশ একটু আধটু ভিজে উঠেছে, এবং দ্রাবির
নদীটিকে নারী হতে নারীকে তরঙ্গ হতে দেখতে চাইছি ওড়িষি নূপুরে।
ঐ তো বনভূমি হয়েছে নীল ঘাড়ে বিদ্যুতের ছবি ঝলক হাসি,
ঐ তো মেঘ ঝড়ে পড়েছে, নদী হয়েছে বন্যা আর বাঁধে দাপাদাপি,
একটি দুটি প্রজন্মেই মানুষও বদলায়, দেবী-রাক্ষসীর পাত্রজা পাশাপাশি
অন্ধকারে ডুব সাঁতারে কোন ঘাটে উঠছে বা হয়তো ঘূর্ণি তারই চাবি।
আর ভীরু বংশধারা ? উত্তরে দক্ষিণে যায়। মৌসুমী বাতাসে চিটে ধান
রসে পুষ্ট হয়ে ওঠে, বাঁজা গোরু হাজা মাঠ হাম্বায় হামলায়
এ বাংলায় ও বাংলায় চেরাগ জ্বালিয়ে গাইছে মুশকিল আসান
'দোয়া কর আল্লা খোদা ভগবান রসুল, এ বান্দা এই চায়',
শুনতে পাচ্ছ ওহে বাঙালি ? ঘটি ও বাঙাল ? ওরা ঁট্যারা হয়েছে
পাশপোর্ট খাতার,
আর আমি গান গাইছি হলদে বোবা ঝরে যাওয়ার বুড়ো শালপাতার।

জীবনানন্দের গল্পের খুকিকে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

হায় খুকি, তুই ছিলি কোনদিন চিত্তনিবিড়
বনচালতায় হরিতে মুগ্ধ একটি কবির
জীবন স্বপ্নে সৃজিতা মেয়ে—
আজ কাকে চেয়ে
একাকীনি এই শহরের পথে
ঘুরিস বেপথু জনসৈকতে ?

অপ্রাপনীয় অথবা নষ্ট নস্‌টাল্‌জিয়া
আজ তোকে আর নেয় কি টানিয়া ?
অসম্পন্ন জীবনের থেকে ঢের ঢের দূরে
শান্ত বরষা ঘুঘুডাকা এক গ্রাম্য দুপুরে
কবির হৃদয়ভরে দিয়েছিল বোলতা-পাখার মৃদু গান্ধারে
হায় খুকি আজ গেলেও সেখানে
যা গিয়েছে ফিরে পাবি কি রে তারে ?

জানি একদিন

পার্থ রাহা

একদিন সমস্ত দরজা জানালা হাট করে খুলে যাবে
চতুর্দিকময় বিষণ্ণতা
কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা
চোরপুলিশ বাঘবন্দী খেল।
দূরলীন
একদিন দূরলীন হবে
আমাদের হাতের মুঠোয়
বৃষ্টিভেজা নীল আকাশ
মুখ
বুক
পা বেয়ে বেয়ে
নেমে আসবে
অজস্র বৃষ্টির ধারা
আকাশ
চাঁদ আর সূর্যের আকাশ
নীল জলরঙের আকাশ
সকালদুপুর রাত্রি একাকার
একাকার
সাদা ঘোড়ার সওয়ার সে কোন দূরযানী বাতাস
দরজা জানালা সব হাট করে খুলে দেবে।

স্বাস্থ্যবিধি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এসো, হাঁটো, জলে ও কাদায়,
এসো, হাঁটো, বনে ও বাদায়,
ছড়ে যাবে, পড়ে যেতে পারো,
তবু হাঁটো, হেঁটে যাও আরো।

তুমি বড়ো সুখের কাঙাল
মেদ বাড়ে, কমাও জঞ্জাল,
খোঁজো তুমি, খুঁজে যেতে থাকো
ঠায় দাঁড়াবার কথা রাখো।

এখনো রয়েছে যেতে যেতে
কিছুদিন সময়ের ক্ষেতে
সোনালি মেয়েটি যায় বুনে
ছুটে তার কথা এসো শুনে।

শ্যাওলা কি জমে থাকা ভালো!
গড়ানে পাথরে জ্বলে আলো।

আহা শ্যামল ছায়ায়

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

বুকের মধ্যে আগুন পোষা থাকে না !
থাকে না বলেই
সময় মতো যা পোড়ানো দরকার
পোড়ানো যায় না;
ক্রোধ জমে জমে একসময়
পাথুরে ঠাণ্ডায় ঘুমোয়;

অথচ তীর ছুড়ে আকাশ থেকে
আগুন এনেছি; পাতাল থেকে জল;
সে তো আমারই জন্যে
আমাদের অন্ধকারে মুঠো করে
জ্যোৎস্না এনে লোকালয়ে ছড়িয়েছি
তাই আমার ইচ্ছাতে অমাবস্যা
যেমন পূর্ণিমা হয়ে যায়
সময় মতো ঠা ঠা বণ্য রোদ্দুর থেকে
ছায়া এনেছি বসতীতে;
আহা ! শ্যামল ছায়ায় থৈ থৈ
ভেসে যায় জনপদ
তবু নিজস্ব আদলে বুকের ভিতর
ক্রোধ জমছে, জমেই যাচ্ছে।

স্বপ্ন

রমেন আচার্য

রাঙ্গা মাটির রাস্তা যখন আস্তে আস্তে এসে
দিঘির পাশে বসে, তখন কি হয় ?
কি কথা কয় বয়স্ক ওই জল
পা ডোবানো তন্বী পথের সাথে।

দগ্ধ দুপুর উস্কে তোলে স্মৃতির যত রেণু
অসহ সব অপমানের ধুলো।
রাঙ্গা মাটির রাস্তা তখন আস্তে আস্তে এসে
শ্যাওলা ঢাকা দিঘির পাশে বসে।
স্বপ্ন দেখে জোয়ার হয়ে বন্দি কালো জল
নাইয়ে দেবে তাকে। ধুইয়ে দেবে
শরীর জোরা লক্ষ পদাঘাত।

বাষ্প হয়ে শুকনো মেঘে জমছে যত ক্ষোভ
দগ্ধ বাতাস উড়ায় শুধু ধুলো,
চতুর্দিকে পাহারা দেয় দিঘির উঁচু পার
কালো জলের বয়স ক্রমে বাড়ে।

মারণ মরণ

দেবকী ঘোষ

জল জলে বীজ ফলে
তা বলে কি করতলে লেখা থাকে কিছু ?
লিখে নিতে হয়।
অপরূপ সব ফুল
তা বলে কি নরকুল সুন্দর সতত ?
রূপারোপে প্রতিভাসে সঁপে দিতে হয়।
বনে বনে বর্ণমিল
সমাহার অনাবিল— অনুকরণীয়
আমার আমিরে ছেড়ে শিখে নিতে হয়।

ছিল যা তা, হে সবুজ,
তার কিছু কি অবুঝ নিয়েছে কখনো ?
ঢেলেছে গরল। পরিপূরকের লয়
যদি ছায় পাতাঝরা রোগ বিশ্বময়।

লাল বল

বাসুদেব দেব

ফিরে এসো লেবুগন্ধ ফিরে এসো ভুল ফলাফল
শব্দ চমৎকার থেকে ও চোখের জল ফিরে এসো
লাল বল কেবল গড়িয়ে নামে
ইঁদুরের মত ছুটে যায় সপ্তাহের পরের সপ্তাহ
বিফল ফাঁদের মত আমাদের ফ্লাট বাড়িখানা
বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে রোদ্দুরে শুকোয়

অসংলগ্ন কথার ভিতর তোমার আমার
দু একটি ছিল তো জোনাকি
এখন আহার নিদ্রা মৈথুন যাপন জুড়ে
অর্থহীনতার মেঘ স্টোভের দহন
ঘুরে ফিরে কেবল চিঠির বাকস দেখা
ফেরে না সে লেবুগন্ধ বুকে ঢাকা নদীর বাতাস

এখন কেবল শ্রম, পরিশ্রম লেখায়, অক্ষরে দীর্ঘশ্বাস
লালবল কেবল গড়িয়ে নামে
সময়ের, প্রকৃতির নিশ্চিত নিয়মে

অবিবাহ

প্রত্যুষ প্রসূন ঘোষ

রুমাল ফেলতে গিয়ে বালতিতে পড়ে না,
উল্টো বাতাসে ভেসে মোজাইকে পড়ে থাকে—
জীবনকে তাসের মতো ছুঁড়ে ফেলতে বিপরীত স্রোতে
ঘুরে এসে আমারই ওপর পড়ে। ছাদের কার্ণিশ ছুঁয়ে
প্যারাপেট ছাড়িয়ে বিষণ্ণ অ্যান্টেনা উদাসীন একা
আকাশে তাকিয়ে থাকে, তার কোন বন্ধু নেই
স্বাতী নক্ষত্রের মতো প্রেমিকাও নেই, ভালোবাসা
কখনো জানলো না, চিলেকোঠায় অবিবাহ যুবকের
মেরুজাবে বেজে ওঠে সেতার, সেই ধ্বনি টেলিগ্রাফ তার
ছুঁয়ে ভাসতে ভাসতে ফুটপাতে আছড়ে পরে অদৃশ্য শ্রবণহীন
স্রোতে কোথায় ভেসে যায়, অনূঢ়া তরুণি না শুনেও
বুঝতে পারে, কোন্ সুর অলক্ষ্য গন্তব্যে যায়,
গোড়ালি পর্যন্ত চোরকাঁটার মতো শিহরণ পাতা ছুঁয়ে
গাছের শিয়র ছুঁয়ে নিরুদ্দিষ্ট তাকিয়ে থাকে,—
উল্টো বাতাস এসে রুমাল উড়িয়ে নেয় ডানার-গভীরে।

তথাগত

পঞ্চানন দুয়ারী

আজকাল ভণ্ডামির-ঔদ্ধত্যের
উন্মত্ত প্রবজ্যা মোহে বাঁধা পড়া সমাজের দ্রোহ
কবে আর রূপ নেবে একটি সচল সম্মুখ বিদ্রোহ।
আছি চেয়ে সেই প্রতীক্ষায়
সেই বিদ্রোহের দিনে
ভণ্ডামির, অন্যায়ের, দুর্নীতির ভিতে গড়া
স্পর্দ্ধিত ঔদ্ধত্যের
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে যাব।

ইচ্ছা

গনদেব ভট্টাচার্য

একটা জীবন সূর্য হোতে চেয়ে
আগুন লেগে মরলো পুড়ে
তার রক্ত দু' চোখ বেয়ে
ঝরলো অবিরাম ঃ
চিতার বুকে কাঠের আসন, নেবে সে বিশ্রাম।

উৎসব

তাপস রায়

উৎসব হেঁটে গেল অন্য পথে। অথবা পথ প্রশ্নহীন
অন্যদিকে ভাসানের টান মেলেছে আকুল।
ঘরবাড়ি। এই খেলনার স্মৃতিহীন নিত্য বসত
রোবট প্রসব করে মানচিত্র জুড়ে। মানচিত্র দেয়ালে বাজছে।
সমর্থনে তৃতীয় বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সাঁতার। এক ফোঁটা ঋণ
নেমে এসে চওড়া আকাশ জুড়ে দিব্য এঁকে দেয়
বন্ধনের খুঁটিনাটি, জলপথ, পুতুলের ময়লা শরীর।

উৎসব অন্য পথে যাবে। মোম-রাত তীব্র উৎসবে।
ফুল, এই অবেলায় ম্লান কেন, টের পাবে গৃহস্থ বাড়ি!

জন্মদিন

ক্ষুদিরাম রাউত

জন্মদিন—
ফি-বছর নতুন করে নিজেকে দেখার দিন
'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে আগুন জ্বালো' স্লোগান
দিয়ে স্বপ্নে হৃদয় ভরানোর দিন।

মনে পড়ে শৈশবের কথা
সাগরদোলা বুকে স্বপ্ন বাড়ে চন্দ্রকলা
হৃদয় আনন্দে আত্মহারা।

আবার এসেছে জন্মদিন
দাঁড়িয়ে ফিরে দেখি যখন
বাজে না আর স্বপনবীন
তবুও উড়িয়ে রঙীন বেলুন
স্বপ্ন দেখি, মজি উৎসবে—জন্মদিন!

সম্পর্ক

উদয় দাশগুপ্ত

মণি, কাঞ্চনকে একবার ডেকে দাও।
—এখানে নেই, সুবর্ণলতার সাথে বেরিয়েছে।
কোথায় যেতে পারে?
—সোনারপুর, নয়তো পদ্মপুকুর।
কেন?
—সুবর্ণ সোনারপুরে থাকে যে।
মণি, তুমি কাঞ্চনের সঙ্গে যাওনা?
—না।
কেন?
—আজকাল ও আমাকে কেবল এড়িয়ে যায়।
কিন্তু!
—সম্ভবতঃ সন্দেহ করে।
কাকে?
—মাণিককে।

বিপন্ন ডায়াল থেকে

কুমারেশ চক্রবর্তী

পেতে আছে কান
খবরে অসমর্থিত, জন্মের ছেঁড়া মানুষ
ভেবেছে, তার জন্যেও আছে পোক্ত নোঙরের কথা,
ভাসন্ত নীলিমার কথা, সামুদ্রিক গভীরতায়
মিথুনের কথা আর, বিভিন্ন ঋতুছোঁয়া
কিছু ফুলেল আশ্লেষের কথা

কিন্তু, এই চৌহদ্দির ভেতরে এসব ভাবনা
নেহাৎ-ই রুগ্ন, ভঙ্গুর, উচ্ছিষ্ট চাঁদে মাখানো
কেননা, নিজেকে নিয়ে গিয়ে শুনেছি
রঙ, নাম্বারে বেজে যাওয়া ঘরের শব্দ;
ঘাস-কথা ছেঁটে যাওয়া সমুদ্রের শব্দ;
দিন ও রাত্রির ছুরির শব্দ; অথচ,
প্লাবনে গবাদি পশুর পাশাপাশি
নিখোঁজ মানুষের কথার মত এইসব কথাও
আর বলা হয়ে ওঠে না—

ডায়ালে পেতে আছে কান
সাদা পাতার দুপাশে অনন্ত
প্রহরায় তবু কালি ও কলম।

দোল

অনুপকুমার বসু

দিনশেষে, শ্বেত সুরভি
ফুটেছিল।
কবির অসমাপ্ত কবিতা
প্রকাশ পাবে নতুন
দিনের ছোঁয়ায়।
মজুরের ঘামে ভেজা জামা দুলছিল
উত্তুরে হাওয়ায়।
শুয়ে থাকা দম্পতির অভিমান
ঘুচবে বলেছিল, ভোরের ছোঁয়ায়।

সেদিনের ভোর শুরু হয়
মেদিনী দোলায় তলিয়ে যাওয়া
হাজারো গোঙরানো কান্নায়।
ভিজে যাওয়া বাতাস
আছড়ে পড়ে পাথর চাপা
শিশুর বুকে।
গণ চিতার লেলিহান রোষ
শুষে নেয় বাতাসে জমানো
শেষ মমতাটুকু।
অসহায় লাল আকাশ তাকিয়েছিল
কিছু বলবে বলে॥

এসো দেশ গড়ি
অমরনাথ ঘোষ

'সংহতি শক্তির মূল'— এটি ঋষি বাণী
'সংহতি কার্যসাধিকা'— এটিকেও মানি।
'সং গচ্ছধং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম'
—সকলে একমনা হয়ে যে যার কাজ করে যাও,
ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করো, বিরোধকে দূর করে দাও।
সম্প্রদায় থাকে থাক, দূরে থাক সাম্প্রদায়িকতা।
এ প্রশ্নে আপোষ নেই, নেই কোন দুর্বলতা।
ভারত বিচিত্র দেশ, বিবিধের দেশও বটে
সবার মিলিত রূপ ভারত-তীর্থে ঘটে।
তুমি আমি সবে মিলে এই পণ করি।
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এসো দেশ গড়ি।
সংহতি বিনাশকারী শক্তির উত্থান,
রোধ করি গড়ে তুলি ভারত মহান।

□ ফিরে পড়া

বুদ্ধিজীবী ও সমাজের বিবেক

অমিয় কুমার বসু

৫ই জুন দেশ পত্রিকায় 'বুদ্ধিজীবী ও সমাজের বিবেক' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধটী পড়ে ভাল লাগল। এই নির্বিচারে অতিমাত্রায় ব্যবহৃত কথাটার ওপর মাননীয় সম্পাদক যে আলোকপাত করেছেন এটা খুবই প্রাসঙ্গিক যেমন প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রাশাসনিক পটভূমিকায় বুদ্ধিজীবী -দের সঠিক ভূমিকাটী নির্ণয় করা। এ সম্পর্কে আরো কিছু বলার অবকাশ আছে মনে করে আমার বক্তব্যটুকু পেশ করতে চাই।

হেমিংওয়ে বুদ্ধিজীবী কথাটার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আমার মনে হয় সম্ভবতঃ সেটা তিনি লঘু মেজাজেই বলে থাকবেন কেননা এ রকমের সংজ্ঞা বিংশশতাব্দীর অভিধানে লিখিত হয়নি। তবে সে অর্থকে গ্রহণ করে বা না করেও বলা চলে যে রাজনীতি ও জনসাধারণ সম্পর্কিত প্রশ্ন ও সমস্যাগুলো সম্পর্কে আজকের দিনের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়, আর এসব নিয়ে চিন্তা তাঁদের করতেই হবে।

বুদ্ধিকে জীবিকার প্রয়োজনে যাঁরা প্রয়োগ করেন, আক্ষরিক অর্থে তাঁরাই বুদ্ধিজীবি একথা খুব ঠিক। না হলে সবাইকে নির্বোধ হতে হয় যা ঠিক নয়। আর এটাও ঠিক যে বুদ্ধিজীবী কথাটা 'ইনটেলেকচুয়াল' কথাটার সমার্থক নয়। সমার্থক শব্দ হিসেবে 'মনীষী' এই কথাটীকে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তি **"vocationally concerned with things of mind"** যাঁরা মননের মধ্যে জীবিত। 'ইনটেলেকচুয়াল' কথাটী কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে এসেছে প্রতিশব্দগত ভাবে। যেমন বার্কের **liberal understanding**, কোলরিজের **clerisy**, জন লকের উত্তরসূরীরা যাদের বলা হত **empiricists** বা প্রত্যক্ষবাদী রুশদেশের **intelligenisia**, **elites**—এসব কথাগুলোকে 'ইনটেলেকচুয়াল' কথাটীর সমার্থক শব্দ হিসেবে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু এসব শব্দের ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে একটা জিনিষ

মোটামুটি ভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভরতা ছাড়া ব্যক্তি মানুষের **emotional contents** অর্থাৎ কল্পনা, অনুভূতি, বিস্ময়, বিশ্বাস, ভালোবাসা বলতে আমরা যা বুঝি — এগুলোকে 'ইনটেলেকট'এর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়নি। ইউরোপে নবজাগরণোত্তর যুগের অনেকেই বিংশশতাব্দীতে এসে 'ইনটেলেকট' কথাটার এই আংশিক অর্থকে মেনে নিতে পারেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ভাঙনের যুগে যাঁরা এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিল তাঁদের মধ্যে কার্ল ম্যানহাইম, রবার্ট মিচেনস্, লিসলী ফীডলারের নাম উল্লেখ্য। এঁরা মনীষা বলতে বুঝেছেন **"the whole great realm of being which is beyond rational perception". (Pacific Spectater autumn issue 1955 : Russel Kirk).**

বুদ্ধিজীবী কথাটার এই ব্যাখ্যা কিন্তু আমরাও ভারতীয় সমাজে গ্রহণ করতে চেয়েছি। যাঁকে আমরা মনীষী বলেছি তাঁকে হৃদয়বত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাইনি আমরা। কিন্তু রাজনীতিতে, সমগ্র প্রশাসন পরিমণ্ডলে সমবেদনা ও সহৃদয়তা থেকে বিশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের দুর্বল ও দারিদ্র্যচিহ্নিত ভূমিকাকে আমাদের দেখে যেতে হচ্ছে। মাননীয় সম্পাদক রাজনীতির বাহিরে বুদ্ধিজীবী সমাজের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : বুদ্ধিজীবী হলেন একধরনের মানুষ যারা কোন না কোন বিষয়ে খ্যাতিমান এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কারণে সমবেত ভাবে একটি করে বিবৃতি দেন কিন্তু বুদ্ধির চেয়ে কিছুটা উঁচু স্তরে বিচরণ করেন এরা। এই নিত্যবচনান্ত শহরে বুদ্ধিজীবীদের বর্তমান ভূমিকা হয়ত এই রকমেরই। কিন্তু বুদ্ধির চেয়ে উঁচুস্তরে বিচরণ করাই যদি এদের পরিচয় হয়, তাহলে তাঁদের আপন স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিতে প্রকাশিত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে যা হোক এঁদের বিবেক রাজনীতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সোচ্চার হলেও শাসক গোষ্ঠীর রাজনীতি এদের স্বীকার করে নেয়নি। এঁরা সমাজের গৃহীত বিবেক হতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিতে অস্বীকৃত ও অনাহূত।

এ তো গেল রাজনীতিক ক্ষেত্রের বাহিরে খ্যাতিমান বিদ্বজ্জন বা জ্ঞানীগুণীদের কথা। সরকারী বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব ক্ষমতাবান এবং খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীরা (যাঁরা অভিজাত বলে গণ্য হন) দেশকে তেড়ে মেরে চালাচ্ছেন

তাদের বুদ্ধিনামক বস্তুটি কীভাবে কাজ করে চলেছে তার উল্লেখ মাননীয় সম্পাদক করেননি। তাঁদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বিরোধীপক্ষের রাজনীতিবিদ এই আখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করে ছেড়ে দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিত্বের তকমা পরিয়ে এই সব দেশপ্রেমিকদের পার্লামেণ্ট, এসেম্বলী, করপোরেশন, পঞ্চায়েতে পাঠানর পরও শহুরে বিবেকের সমবেত কণ্ঠে আবেদন, নিবেদন, বিবৃতির তেমন প্রয়োজন কী থাকা উচিৎ ছিল যদি এঁরা সাধারণ বুদ্ধিজীবী হিসেবেও তাঁদের পরিচয় রেখে যেতে পারতেন! দু'চারজন হাতে গোনা প্রশাসনবিদ ও রাজনীতিক নেতা বাদ দিলে, এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এক জাতের ভাবলেশহীন শিক্ষিতাভিমানী বা অর্ধশিক্ষিত যান্ত্রিক গোষ্ঠী যাঁদের লৌহকঠিন দরজায় হৃদয়ের আবেদন বার বার ঘা খেয়ে ফিরে আসে। অগণিত মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি এই সব বুদ্ধিজীবীরা (রাজনৈতিক অর্থে), যাঁরা লোভ ও ক্ষমতার কাছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে দৈন্যের মধ্যে নিঃশেষিত হতে লজ্জা পাননি, তাদের রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধিজনিত প্রমত্ততা কী কোন রাজনৈতিক দর্শনকে সূচিত করে? যেখানে রাজনীতিক দলাদলির ফলশ্রুতি হচ্ছে অভদ্রতা, অসভ্যতা, অমূল্য প্রাণের বিনষ্টি, যেখানে মানুষ মরলে আগে দেখা হয় লোকটি কোন দলের ছিল, সেখানে দলীয় চরিত্রের কী জাতীয় অবক্ষয়ের দরুন এই বিচ্যুতি ঘটে যাচ্ছে, সেটা গভীর ভাবে ভেবে দেখবার বিষয়।

ইনটেলেকচুয়াল অর্থে বুদ্ধিজীবী কথাটার কী সংজ্ঞা হওয়া উচিৎ সেটা আলোচনা করে নিতে হল প্রধানতঃ এই কারণে যে আজকের প্রশাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ কী সেটা তুলনামূলক ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। কিছুদিন আগে (৩০শে সেপ্টেম্বর '৮১ : আজকাল) ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রধান সম্পাদক এস, নেহাল সিং 'বুদ্ধিজীবীর বিচ্ছিন্নতা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক অধঃপতন, প্রাশাসনিক দুর্নীতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি বিষয়ের সমালোচনা করেন। তাছাড়া প্রশাসনে আসীন ও তার বাইরে পদলেহী ও স্তাবকতাসর্বস্ব দলবাজী বুদ্ধিজীবীদের 'আখেরে গোছান' মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন। অবশ্য এঁরা রাজনীতিক অর্থে বুদ্ধিজীবী। তাঁর আলোচনা

তথানিষ্ঠ এবং যেহেতু মূল্যায়ণধর্মী সেহেতু সারবান বলা যেতে পারে। কিন্তু যখন বলেন যে বহু বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা দেশের ভাগ্যকে দুষ্কৃতকারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রুদ্ধদ্বারকক্ষে সমস্ত দুনিয়া থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে বই ও চিন্তার জগতে বিচরণ করছেন এবং এ ঝুঁকিটা এদের ভেতর ক্রমশঃই প্রকট হয়ে উঠেছে তখন তাঁর এই মন্তব্য এই অর্থে অসমচীন বলে মনে হয় যে ইনটেলেকচুয়াল অর্থে এই সব বুদ্ধিজীবীদের আপাত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে তিনি আস্থাশীল নন। কিন্তু এরা যে গজদন্ত মিনারে বসে বসে বিশ্বনিন্দায় মুখরিত হন শুধু তা নয়, সুযোগ পেলে রাজনীতিকদের আত্মম্ভরিতায় ঘা লাগান, এ কথা অবশ্য স্বীকার করেন তিনি। কিন্তু জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় হয়েও যদি রাজনৈতিক দলের এই সব বুদ্ধিজীবী উঁচুদরের নেতৃত্বের কাছে বিবেককে বাঁধা রাখেন তখন তো বাহির থেকে এক জাতের বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ, পরামর্শ, ও সুস্থ সমালোচনার প্রয়োজনকে অকস্মীর করা চলে না মানবতার খাতিরে, জনস্বার্থের দিকে চেয়ে। যেহেতু তাঁরা চিন্তার জগতে বিচরণ করেন, বা লেখক, বা সংস্কৃতিবান এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে থাকছেন সেহেতু তাঁরা দেশের কোন কাজে আসছেন না এ কথার মধ্যে জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এই বিবেকবান সুধীসমাজ আছে বলেই রাজনীতির দলীয় আগ্রাসনকে কিছুটাও রোখা সম্ভব হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। এই সব বুদ্ধিজীবি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন ঠিকই তার কারণ তাঁরা রাজনীতিতে আসতে চাইলেই তাঁদের জন্যে দরজা খুলে দেওয়া হবে না। সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যক্তিকৃতি অর্থাৎ মননশিতা, প্রজ্ঞা, মৈত্রী, করুণা, ঔদার্য্য, সেবা যেগুলোকে বলা হয় **'fundamental qualities of head and heart'**— এই গুণাবলী যখন গৌণ, দলের টিকিট যেখানে যে কোন প্রার্থীর মূলধন, প্রচার যেখানে একে অন্যকে বিদ্ধ করতে তৎপর, সরকার বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য যেখানে অসহযোগিতা, সেখানে ইনটেলেকচুয়াল অর্থে সত্যিকার বুদ্ধিজীবীদের স্থান কোথায়? ঢোকার অবকাশই বা কোথায়? আর যদি বা দু'চারজন সৎ ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী প্রবেশাধিকার পান তাঁরা ঠাটবাটে বন্দী হয়ে টুটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকেন। রূপান্তর করতে এসে, নিজেরাই রূপান্তরিত হন। অসাধারণ মাপের বুদ্ধিজীবী

যাঁরা নন অথচ শিক্ষিত ও উগ্র আত্মম্ভরিতা থেকে কিছুটা মুক্ত এঁদের ব্যর্থতার কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থার কতটুকু উল্লেখযোগ্য সংস্কার করতে পেরেছেন এ পর্যন্ত, মনীষী পর্যায়ের প্রবাদ পুরুষেরা যাঁরা দলের ও সরকারী নেতৃত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হয়েও শুধু 'অরনামেন্টাল হেড্স' হয়ে বিরাজ করছেন? কতটুকু বিশুদ্ধির সঞ্চার করতে পেরেছেন তদানীন্তন ভারতের রাজনীতিমানসে সেই মুক্তগাত্র খাটোকাপড় পড়া মানুষটি যাঁকে জাতির পিতা বলে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে থাকেন শাসক ও বিরোধী দলের বিবাদমান নেতৃবৃন্দ। অথচ যাঁকে মাতৃভূমি ব্যবচ্ছেদের দুঃসহ বেদনাকে নীরবে বহন করে বলতে হয়েছিল: **My heart has dried up and on this day of independence and partition. I have nothing to say to any body. Let others rejoice, leave me alone to shed my tears.—Missinn with Mountbatten : Alan Campbell Jhonson.**

মানুষের হীনতম মুহূর্তটা কখন? না, যখন সে নিজের কাছে নিজে খাটো হতে থাকে, জেনে হোক না-জেনে হোক। আর এই খাটো হবার হিসেবটাকে সে মনুষ্যত্বের বেদনাময় পরাভব বলে ধরে না। আমি এ কথা বলিনে, অতীতে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতারা দেশকে ভালোবাসেন নি বা এখনো বাসেন না। কিন্তু দেশকে গড়ে তোলবার স্বাধিকার লাভ করেও খ্যাতিমান ও দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবীরা কেন এমন হতে পারলেন— এ প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বার বার মনে হয় যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব রাজনীতি ও প্রশাসন ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধকে নির্বাসন দিতে চলেছেন, সমাজ ও জাতীয় জীবনে যার গুরুত্ব অপরিসীম, আর যার ভয়াবহ অবক্ষয় শাসক ও বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের শুভদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। লোভাতুরতা, আত্মম্ভরিতা তাই উদগ্র হয়ে উঠেছে। সরকার ও সাধারণ মানুষে মিল হচ্ছে না। মাঝে দুস্তর ব্যবধান। রাজনীতি মানবনীতি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। দেশের মাটী বড় মানুষ বড়, তাদের প্রত্যাশা পূরণের দায় আরো বড়— একথা চিন্তা, উপলব্ধি ও জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে সঞ্চারের অপরিহার্যতাকে মেনে নিতে না পারলে বোধকরি এই অনভিজাত মানসিকতার রূপান্তর সম্ভব নয়।

ক্যাবিনেট, পার্লামেন্ট, এ্যাসেম্বলী, পঞ্চায়েৎ, প্রশাসনের সমস্ত বিভাগে সুশীল, শুভার্থী, উঁচু জাতের মানুষের জায়গা করে দিতে হবে, যারা হৃদয়বান। কিছু এমন মানুষ জায়গা পেলেও কী রাজনীতি ও প্রশাসন সংস্কৃত ও শোধিত হয়ে উঠবে না? দেশের মাটী বড়, মানুষ বড়, তার সার্বিক প্রত্যাশা পূরণের দায় ও দায়ীত্ব আরো বড়—একথা চিন্তা, উপলব্ধি ও জীবনচর্যার ভেতর দিয়ে আত্মস্থ করতে না পারলে এই অনভিজাত মানসিকতার রূপান্তর সম্ভব নয়। তবেই যদি এই নোংরামি কমে। ঘরে বাইরে মনীষার অবক্ষয়ের জন্যে অশ্রুপাত করতে না হয়। আকাশে মেঘ কেটে গিয়ে নির্মল প্রভাতের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

[রচনাকাল ১৪-৭-৮২]

চলচ্চিত্র ঃ পশ্চিমী নিউ-ওয়েভ ও একটি ভারতীয় প্রশ্ন

উনিশশো বাষট্টিতে ভেনিসে অনুষ্ঠিত ফিল্ম ফেষ্টিভেলে কোন ফিল্ম-জার্নালিষ্ট জাঁ লুক গদারেকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি তাঁর 'ব্রিদলেস' ছবিটি তৈরী করার সময় নতুন কিছু দেবার কথা ভেবেছিলেন কি-না। গদার তার উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, সবকিছুই ছায়াছবিতে নেওয়া চলে"। ঠিক একই কথা বলে আসছেন 'নুভেলভাগ'-এর পথিকৃৎরা দীর্ঘদিন ধরে। তাঁদের মতে, ভাল-মন্দ বলে কিছু নেই। মানুষকে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে আবিষ্কারই আসল কথা। আধুনিক মনের ক্রমপ্রসারিত বিস্তার, আর ওপরে নীচে যে অজস্র আবর্ত, তাকে বীক্ষণই মূল লক্ষ্য। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতে যে প্রতিক্রিয়া, তার মধ্য দিয়ে জীবনের নতুন কিছু দেখা গেল কি-না, সেটাকে তুলে ধরা। সেটা বিস্ময়কর হতে পারে, বীভৎস হতে পারে, পৈশাচিক হতে পারে—তাতে কিছু এসে যায় না। এটাই সর্বাধুনিক সিনেমারীতি যা বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে পশ্চিম দুনিয়ায়।

কিন্তু এই নিওরিয়েলিজমকে পর্দায় প্রতিফলিত করতে গিয়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে লিবিডা-আর্জ বা নগ্ন যৌনতা, আর তা থেকে উদ্ভূত আনুষঙ্গিক বৃত্তিগুলো। নিউ-ওয়েভের শিল্পরীতির মন্থর বিবর্তন ধারায় আমরা যেসব নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছি এপর্যন্তকাল, তার মধ্যে পরিচালকদের কোন স্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে, একথা বলা চলে না। চলচ্চিত্র যে একটা ক্রিয়েটিভ আর্ট হতে পারে, একথা তাঁরা বলতে চাইছেন না। কথাটা উল্লেখ করার দরকার হল এই জন্যে যে, এঁদের মনের মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতি, প্রকরণ সব পাল্টাচ্ছে। কাজেই বলা চলে, ওদেশের চলচ্চিত্র-শিল্প সংজ্ঞা ও দৃষ্টিকোণ বদল করেছে বহুবার। এখনো তার শেষ হয়নি।

কলকাতার চলচ্চিত্র জগতে এই 'বৈপ্লবিক' খোলা হাওয়া তেমন করে লাগেনি

বলে অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বোম্বে তাঁদের নিরাশ করেনি। কলকাতায় ষাটের দশকের পরে ও সত্তর দশকে অনেক ছবি তৈরী হয়েছে, যাতে নিউ-ওয়েভের প্রভাব সক্রিয়। কিন্তু এ করতে গিয়ে চলচ্চিত্রের সৃষ্টিধর্মিতার দিকটা খুব কম ক্ষেত্রেই রূপায়িত হয়েছে। আর তাছাড়া নিখুঁত বাস্তবকে ছবিতে ধরতে গিয়ে অর্থবহ শৈল্পিক ইঙ্গিতকে প্রয়োগ না করে অশালীন ও বে-আব্রু দৃশ্যের প্রদর্শনের মেজাজটা বহু পরিচালক একটা নতুন টেকনিক হিসেবে চালু করেছেন। বক্স অফিসের ড্রয়ারে টাকা পড়ছে গাদাগাদা। ব্যস্। আর যে দিকটা খোয়া গেল, সেদিকে খেয়ালের দরকার কী!

আমাদের দেশেরও কিছু কিছু অধুনা সংস্কারমুক্ত নবীন-প্রবীণ চলচ্চিত্রনির্মাতা আছেন, যাঁরা মনে করেন বেশীমাত্রায় পর্ণোগ্রাফিক হওয়ার মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে। নারী দেহের কোন কোন অংশ, অশালীন যৌনদৃশ্য ও সংলাপ দেখানর ভেতর একটা বিশেষ ধরনের আর্ট লুকিয়ে আছে—যা না দেখালে সিনেমা আর্ট হিসাবে জাতে উঠবে না। ছবি করতে গিয়ে স্বেচ্ছাকৃত প্রশ্রয় যেখানে শিল্প-রুচিকে ব্যাহত করছে, তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলে তাঁরা 'নীতিবাগীশ' এই বিশেষণটা দিয়ে প্রতিবাদকে বিদ্রূপ করেন। শুচিবায়ুগ্রস্ততার ভূত কাঁধে চাপালে -ই না কি এজাতের নীতিবোধের ঘ্যানঘ্যানানি আসে। তাঁদের যুক্তি এই যে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যা স্বাভাবিক বা সময় বিশেষে বেগমান, তার গতিপথ অবরুদ্ধ করলে বিস্ফোরণ অনিবার্য।

এ নিয়ে অবশ্য বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ভাল ছবি করতে গেলে বাছবিচার করতে হবে দর্শকের মনযোগানো চলচ্চিত্রের দায়—একথা মেনে নিয়েও কিন্তু ত্রুফো বা হাউসটন দর্শকদের মন ও চোখের ওপর 'প্ল্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-কে সমর্থন করেছেন। কথাটার তাৎপর্য এই যে, ভাল ফিল্মে এমন কিছু জোর করে দেখাতে হবে, যা দর্শকেরা দেখতে চায় না। অনেকটা কায়দাকলম করে তিতো ওষুধ গেলানোর মতো। তাতে যদি সিনেমা মাইনরিটি আর্টে পর্যবসিত হয়, হোক।

দায়িত্ববান চিত্রনির্মাতা যাঁরা, যাঁরা চলচ্চিত্রের মানকে উন্নত করে সাধারণ রুচির কিছুটা রূপান্তর ঘটাতে চান, তাঁদের বোধকরি মনে করিয়ে দেওয়াটা ভুল

হবে না যে, ছবির পর্দায় লিবিডো-আর্জ বা অন্য ভাষায় ঝকঝকে রগরগে যৌনতা-কে নির্বিচারে পরিবেশনের মধ্যে কোন আর্ট লুকিয়ে নেই। কোন আধুনিক ফিল্ম সমালোচক যদি একথা বলেন যে, এতে করে সমসাময়িক যুগের ক্রম ক্ষীয়মাণ বিশুদ্ধ শিল্পবোধ, নান্দনিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন হচ্ছে না, তাহলে আমি দুঃখিত। সেক্স-সাবলিমেশন বলেও একটা কথা আছে। চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপের ভেতর দিয়ে এই সাবলিমেশনের প্রবণতাকে পরিবেশন করা কি 'নিও-রিয়েলিজম'-এর এক্তিয়ারভুক্ত নয়? নারী-পুরুষের প্রেম কি শুধু দেহসর্বস্বতার মধ্যেই শেষ? দেহের প্রয়োজনকে সহজভাবে স্বীকার করে নিয়ে কি ভারতীয় প্রেম বাঁচতে জানে না? সস্তা প্রশস্তি কুড়োবার জন্যে পশ্চিমী ধাঁচকে ঠাঁই করে দিতেই হবে এমন কোন দাসখত নিশ্চয়ই লিখে দেওয়া উচিত কি?

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় চিত্রনির্মাতাদের কাছে সম্প্রতি যে আবেদন জানিয়েছেন, সেটা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ছবিতে সেক্স ও ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্যকে কলকাতা ও বম্বের পরিচালকেরা উপেক্ষা করবেন না, আশাকরি।

পশ্চিমী দুনিয়ার নতুন তরঙ্গের প্রবীণ-নবীন চলচ্চিত্র পরিচালকেরা নিত্য নতুন শিল্পরীতি প্রবর্তন করে চলেছেন। তাঁরা একদিকে যেমন বহু জনস্বীকৃত, বিশ্রুত, অন্যদিকে বহু বিতর্কিতও বটে। আধুনিক আমেরিকান নিউ-ওয়েভের নব পথিকৃৎ জর্জ লুকাস নাকি গদারেকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি দুখানা ছবি করেই হলিউডকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন, শোনা যাচ্ছে। বক্স অফিস উপচে পড়ছে। আমি বুঝে উঠতে পারিনি এ কি হতে-পারার ছবি, হয়ে-ওঠার ছবি? উত্তরণের উর্দ্ধায়নের গভীরতর প্রশ্নকে সরিয়ে রেখে শুধু রূঢ়তম তিক্ততম নিখুঁত বাস্তবের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবার প্রয়াস নয়? থ্রিল, ভায়োলেন্স, বক্স অফিস —এ দিয়ে কি আর্ট হয়, ক্রিয়েটিভ আর্ট? মানুষকে ঘিরেই তো সব। সেই মানবমহিমার কি ভাবমূর্তি আজকের মানুষের চিত্তপটে আঁকা হল, এই অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে, এই প্রশ্নটি আমি রেখে যেতে চাই।

[রচনাকাল জুন '৮২]

হরেকরম্বা প্যাটার্নের রবীন্দ্রভক্তির নজির সত্যিই অপূর্ব !

২৫শে বৈশাখের দিনটি বার বার ফিরে ফিরে আসে। বার বারই উৎসবের সাড়া পড়ে দেশজুড়ে। ধুলোপড়া ছবিগুলো মূর্ত্তিগুলোতে হাত পড়ে। মণ্ডপ তৈরী হয়। আলো, মালা ধূপ ধুনো। গান, কবিতা, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য, বক্তৃতায় দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনতল মুখরিত হয়। পেশাদার, অপেশাদার লেখক-লেখিকাদের লেখায় পত্র-পত্রিকাগুলো ভারী হয়ে ওঠে। মিছিল করে গান গাওয়া, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি এসবও বাদ যায় না।

অতীতে দেখেছি। এবারেও দেখলাম শিল্পপতিরা কেমন করে রবীন্দ্রনাথ নামক একটী বিশ্রুত ব্যক্তির ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অমন বেছে বেছে মোক্ষম পংক্তি যোগাড় করা তো আমার সাধ্যে কুলোত না। কেউ লিখলেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' (অবশ্য সুপরিচিত পংক্তি)। কেউ লিখলেন 'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন'। কেউ লিখলেন 'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি'। রেলগাড়ী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন না কী ? তা জানলাম গতির প্রতিনিধি রেল বিভাগের শ্রদ্ধানিবেদনের কায়দায় 'চলে রেলগাড়ী, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ধ্বনি রেখা টেনে নিয়ে বাতাসের বুকে'। আগে শঙ্কা, পরে স্বস্তি। যদি রোদেনষ্টাইনের বাড়ী যাবার পথে এ্যাটাচিটা হারিয়ে যেত তা হলে গীতাঞ্জলির কী দশা হত— রথীন্দ্রনাথের আতঙ্কিত উক্তি— মেট্রোরেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি। চা' এর কোম্পানীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেলফ্-প্রোপ্রাইটের কী সম্পর্ক বোঝা গেল না তবুও দেখতে হল 'আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে বেশ সুন্দর হয়েছে তখন আমি তা নষ্ট করে দি'। এমন হরেকরম্বা প্যাটার্নের রবীন্দ্রভক্তির নজির সত্যিই অপূর্ব !

কথায় বলে ভাঙিয়ে খাওয়া। এই বড় মানুষদের ভাঙিয়ে খাওয়ার আর্টকে যখন আমরা কায়দা করেছি এবং এটা আমাদের চরিত্রে পাকাপাকি ভাবে কায়েম হয়ে গেছে তখন রবীন্দ্রনাথেরা আমাদের চিন্তা ও জীবনচর্যার ক্ষেত্রে যে

অপ্রাসঙ্গিক সে কথাটি মেনে না নিয়ে তিনি যথেষ্টের ভাবে বেঁচে আছেন এই প্রজন্মের অজ্ঞতা ও অনায়াসধর্মিতার মধ্যে এটা মেনে নেওয়াটা ভণ্ডামি। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের চেতনার এই স্পষ্টতা থাকলে, অপরাধ বোধের বোঝাটা কিঞ্চিৎ হাল্কা হত। এই সূত্র টেনে একটা কথা বলা যেতে পারে যে পঞ্চাশের দশকের পরের যে প্রজন্ম তার মন আলগা, বাহিরে ছিটানো ছড়ানো তারা তাদের অনায়াসী শিথিল মনের রং আর রুচি দিয়ে, ছোটখাটো, ছাটকাট করা রবীন্দ্রনাথকে তৈরী করে চলেছে, তার গোটাটুকু বুঝে নেবার দুরূহ দায় থেকে মুক্ত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ একটি কনসাইজ ডিক্সনারী। আপত্তি ছিল না কিন্তু এতে করে অনিবার্যভাবে সমকালীনতার অপরিসর প্রিজম্'এর ভেতর দিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর পূর্ণমানসরূপটিকে আমরা নস্যাৎ করে দিয়েছি। বাদ দিয়েছি তাঁর 'ফাণ্ডামাণ্টালস'কে বা স্ব-ভাবকে যার ওপর তিনি দাঁড়িয়ে। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায় যে তথাকথিত রবীন্দ্র অনুরাগীদের একটা বড় অংশ যাঁরা গান, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রমানসের পরিচিতি লাভে পরিতুষ্ট তাঁদের শিথিল মন তাঁর সৃষ্টির মূল সুরটা ধরতে না পেরে বহিরাড়ম্বরের যে আয়োজন করে আসছেন তাতে এ প্রজন্মের কাছে তাঁর মানসমূর্ত্তির অহরহ মৃত্যু ঘটছে, না তিনি আরো বেশি করে বেঁচে উঠছেন—এ প্রশ্নটা নিয়ে তারা ভাবতে শুরু করেননি বোধকরি।

চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এত গায়ক গায়িকা ছিল না— এখনকার মতো। কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম বাঁধা। উঠতিরাই ঠাঁই পাচ্ছেন সেখানে। টিভিতে অতটা নয় কেননা সেখানে অপটুদের লাইন করা, একটু শক্ত। গান শেখাবার ছোটবড় আসর অজস্র। অথচ গান গাইবার মন নেই, সাধনা নেই। কাকে উদ্দেশ্য করে গান, তার মানে কী, তার গীতিমানসের কোন দিকটা গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে—এগুলি না জেনেও বেশ উঁচুদরের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হওয়া যায় আর তার পথও খোলা। অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রমানস সম্পর্কে অজ্ঞতা এইসব শিল্পীদের লজ্জিত করে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত কী ? কাকে নিয়ে ? এ প্রশ্নটি আমার মনে হয় প্রাসঙ্গিক। তাঁর কিছু কিছু গান বাদ দিলে আর সমস্ত গানই অঞ্জলি, প্রণতি। কবি স্রষ্টার

অপার মহিমার নিবিড় উপলব্ধির পথে নিজের সঙ্গে রসঘন বিরহসুন্দর সম্পর্ককে আবিষ্কার করে চলেছেন তাঁর অন্তরলোকের ক্রমবিবর্তনের শিখর মুহূর্তগুলোতে। তাঁর সঙ্গীত হচ্ছে উপাসনা। ব্যক্তিসত্তার গহনতলের গোপন ধূপগন্ধ। কিন্তু এই গীতিমানসকে কিছুটাও না বুঝে কী করে কিছু পরিমানে তদ্ভাব ভাবিত না হয়ে কী করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হওয়া যায় বুঝিনে। শুধু যে এইটেই ত্রুটি তা নয়। এমন গলায় গান গাওয়া হচ্ছে যাতে দরদ নেই, স্বরক্ষেপ, উচ্চারণ, সুরবিহার স্বেচ্ছাচার চিহ্নিত। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যন্ত্রানুষঙ্গে ত্রুটি শোধরাবার অপচেষ্টা। অথচ এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক বা গায়িকা হিসেবে অবাধ চাপরাশ পাচ্ছেন। কিন্তু অপটু সাধনাবিমুখ গায়ক গায়িকার স্বাধীনতা তো রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বীকৃত হয়নি। তাঁর সঙ্গীতের এই নিপীড়ন যে হতে পারছে এ শুধু এইসব পেশাদার গায়ক গায়িকার অজ্ঞতা ও অন্ধতার জন্য। তাঁর গান নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত ছিল না কখনই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ওপর দিয়ে ষ্টীম রোলার চালাতে মানা করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশাতেই। কেননা তৃতীয় দশকের শেষের দিকেই তিনি গায়ক গায়িকাদের এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। যতটুকু ছাড় তিনি দিতে রাজী ছিলেন তা শুধু প্রতিভাবানদের বেলায়।

রবীন্দ্রস্নেহধন্য স্বর্গতঃ দিলীপ রায়কে আজকের যুগ কতটা মনে রেখেছেন জানিনে। যখনকার কথা বলছি তখন বাংলা দেশে তাঁর গানের খুব কদর। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষাকে কবি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন। দিলীপ রায় কবির কাছে প্রায়ই যেতেন। তখন তাঁর 'সাঙ্গীতিকী' সবে বেরিয়েছে। সাঙ্গীতিকীর আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন কবি তাঁর নিজের গান সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, তার কিছু অংশ আমি তুলে দিলাম এই মনে করে যে এ কথাগুলো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলে অত্যুৎসাহী গায়ক গায়িকা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁর গানের ওপর সুবিচার করতেও পারেন।

প্রশ্ন : আপনি নূতন সৃষ্টির কথা এত বললেন, স্বকীয়তাকে সমর্থনও করলেন অথচ এতদিন আপনি স্বরচিত গানের ব্যাপারে একটু রক্ষনশীল ছিলেন না কী ?

উত্তর : এখনো আমি সমানই রক্ষণশীল আছি। তবে একটা ব্যাপার আছে।

তোমাদের মতো প্রতিভাবান শিল্পী দিয়ে আমার কোন ভয় নেই। কিন্তু এ পথ সবার জন্য নয় জেনো। যাকে তাকে যদৃচ্ছ পক্ষবিস্তারের স্বাধীনতা দিলে সুফলের পরিবর্তে অপফলটিই ফলবে বেশি। খুব মুষ্টিমেয় শিল্পী গায়কদের 'পরে থাকবে এ দায়িত্ব। চণ্ডালিকার গানগুলো সম্পর্কে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন : 'গানের ভেতর দিয়ে যে জিনিষটা আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই, সেটা আমি কারো গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে। একটি মাত্র মেয়েকে জানতুম। সে আমার গানের মূল সুরটি ধরতে পেরেছিল সে হচ্ছে ঝুনু— সাহানা'।

ওপরের আলোচনা ও রবীন্দ্রনাথেরনিজের উক্তির পটভূমিকায় আজকালকার জমজমাট গানের আসরগুলোকে (নৃত্যনাট্য আবৃত্তি সমেত) যদি 'কালচারাল ক্লোক টু ফ্লুট' বলে কেউ আখ্যা দেন তাহলে তাকে তেড়ে আসার আগে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে যে বিশেষণটা নিষ্ঠুর ভাবে সত্য কী না। অবশ্য যে লেখিকা কিছুদিন আগে কোন ইংরেজী দৈনিকে বলেছিলেন যে এসব 'শো' বন্ধ করে দিয়ে কিছুদিনের জন্য 'সুখকর স্তব্ধতা' পালন করলে রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে দেখার চোখটা খুলে যেতে পারে। তাঁর মতো অতটা নির্দয় না হয়ে আমার বলার কথা এই যে রবীন্দ্রমানসমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশের প্রস্তুতিক্ষেত্র তৈরী না করে আজকের দিনের তরুণ গায়ক গায়িকারা এমন ভাবে গান না করেন; নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরা চেতনার নূতনতর আলোকে স্নাত হয়ে তাঁকে নূতন করে, তার স্বরূপে তাকে আবিষ্কারের শিল্পীজনোচিত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন।

বর্তমান প্রজন্ম তাদের অসামর্থকে স্বীকার করে নিয়ে একথা বলতে পারেনি যে তারা তাদের জীবনচর্যার মধ্যে মহৎকে অন্তর থেকে স্থান করে দিতে পেরেছে। এবং ঠিক সেই কারণেই পারেনি তারা রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করতে। প্রকৃতিগত, পরিবেশগত, জীবিকাগত বাধা এই অনীহার অব্যবহিত কারণ বলে মেনে নেবার যে যুক্তি, তার জোর আছে হয়ত কিন্তু তা শিল্পীর স্বীকৃতি নয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনন্য, অসাধারণ, যেখানে তিনি কঠিন বলে সুন্দর- যেখানে যেখানে তিনি অন্তঃসারকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকেই আমরা সরে এসেছি, পালিয়ে এসেছি। বেশিকরে তাঁকে বুঝতে গিয়ে, অনেক কম করে জানার গণ্ডির মধ্যে

ঘোরপাক খাচ্ছি। অল্প কিছু গান, কবিতা, নৃত্যনাট্য আর আবৃত্তির একঘেয়েমির এই বিরাট মানুষটির পরিচিতি আজকের যুগে নিঃশেষিত হতে চলেছে।

আজকের যুগের মহাজনেরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের শক্তিটা কিন্তু আসলে সর্বক্ষেত্রেই আত্মম্ভরিতার দৈন্য, কিন্তু এখানে মনুষ্যত্বের পুঁজিতে আমাদের যে ঘাটতি সে সম্পর্কে সচেতনতাটা এ যুগের চিন্তার বাইরে। সভ্যতার ভিত্তির রদবদলের হাওয়াটাই যুগকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তাই বড়কে ধরে রাখতে না পারলে জীবন ব্যর্থ এমন কথা মনে জাগে না। কিন্তু আমার মনে হয় এটা সুস্থতা নয়। রবীন্দ্রনাথের মহদাশ্রয়ী শিল্পসত্তাকে যদি যুগ মেনে নেয়, তাহলে তাঁর সম্পর্কে সচেতনতার এই মারাত্মক অভাব সত্ত্বেও এ যুগের তরুণ মানস ও বুদ্ধিজীবী এতটা আত্মতুষ্টিতে আচ্ছন্ন কেন এটা খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে। এ যুগ যে তাঁকে শুধু কবি, গীতিকার, নাট্যকার হিসেবে ই বুঝে নিতে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, তাঁর দার্শনিক চেতনা, মানবমূল্যায়ণের মূল সত্যকে গ্রহন করাও সম্ভব হয়নি এ যুগের পক্ষে। দেশের শিক্ষাভিমানী নবীন প্রবীন বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, বিত্তশালী মানুষের একটা বড় অংশ রবীন্দ্রনাথকে বোঝেন বলে দাবী করেন। কেননা তাঁকে স্মরণ করার শুভদিনে তারাই তাঁর ছবিতে মালা দেন, জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন প্রধান অতিথি হিসেবে। অথচ এঁদের মধ্যে কতোজন উগ্র বৈষয়িকতার মধ্যে মহাব্যস্ত নন, কতোজন রবীন্দ্রচিন্তায় অনুপ্রাণিত নন, কতোজন নিরীশ্বরবাদী নন, তার কোন হিসেব নেওয়া হয়নি। তাই বলে যেতে চাই, তার সম্পর্কে এ যুগের তাকে তখনই বিক্ষুব্ধ ও বিম্বিত চেতনার আংশিক রূপান্তর চাই, ভাব ভাবনার মোড় ফেরানো চাই—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও শিক্ষাভিত্তিক পর্যায়ে যেখানে তাকে গ্রহণ করার শক্তিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

[রচনাকাল '৮৩]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা/তত্ত্ব ও জীবন

জীবেন্দু রায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে একজন আধুনিক আলোচকের কথা একটু উদ্ধৃত করছি। সে মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা অবিসংবাদিত বলে নয়, আপাত প্রতীতিতে এই কবি সম্বন্ধে যে নানারকম বিপরীতমুখী আবর্ত বিদ্যমান সেইটি দেখিয়ে দেওয়াই এই উদ্ধৃতি।

আলোচক লিখেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) মার্কসবাদী কবিদের অগ্রগণ্য হয়েও নানা কারণে আজকে একটি স্বল্পোচ্চারিত নামে পর্যবসিত হয়েছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচক সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আলোচনা থেকে খারিজ করেন চারটি কারণে—

১। বিষয়ের একদেশদর্শিতা। আধুনিক জীবনের জটিল রূপের পরিচয় নেই।

২। লেখায় স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও বিত্ত কম।

৩। ঐতিহ্যের সঙ্গে শিথিল সংযোগ।

এই আলোচক আরও লিখেছেন, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় সামাজিক বিবেককে কাব্যের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছেন। আধুনিকতার চেয়ে সাম্প্রতিকতা তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠতা এবং দুর্বলতা দুই-ই এনেছে। আশাবাদের উজ্জ্বলতা জীবনের মলিনতাকে কখনই প্রশ্রয় দেননি বলে তাঁর কাব্য একপেশে মনে হতে পারে। প্রেমকে অস্বীকার করেও সেই প্রসঙ্গে ভাবালুতায় আত্মসমর্পন করা সুভাষের অন্যতম ত্রুটি। একেবারে হাল আমলে সুভাষের রাজনৈতিক মতের চেয়ে সহজ মানবতা-বাদের ভ্রান্ত রূপ, বয়সের বিষণ্ণতাকে আমল দেওয়ার ফলে সুভাষ বামপন্থী স্বীকৃতিও হারিয়েছেন। অথচ চল্লিশের দশকে সুভাষের কবিতায় রাজনৈতিক ধারার সূচনা হয়েছিল। প্রবীণ কলাকৌশল ও ছন্দের তীক্ষ্ণতা, লোকভাষার কাব্যিক রূপায়ণের সামর্থ্য 'পদাতিক'-এ এক নতুন আলো জ্বেলেছিল তাকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন।'১

এসব কথা প্রকৃতই ভাববার। তার সবই গ্রহণযোগ্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে নয়। কিন্তু এইসব পছন্দ-অপছন্দে মেশানো বাক্যবন্ধে সমালোচনা শুধু সুভাষ

সম্পর্কে সাহিত্যিক মতামত মাত্র প্রকাশ করেননি, পরন্তু নিজেও যে এক বিশেষ রাজনীতিক—পক্ষপাত তথা আবর্তে জড়িয়ে পড়েছেন—সমালোচনায় সেই অবাঞ্ছিত রাজনীতিক প্রতিফলন লক্ষ্য করার। একে কেবল ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার মাত্র হিসেবে বিবেচনা করা একেবারেই ঠিক হবে না। দীর্ঘকাল ধরে সমাজতন্ত্রবাদে আস্থা বা আনুগত্য স্থাপনের নামে এই অনুচিত কর্ম আমরা করে এসেছি। তাই ভবানী সেনেরা স্বয়ং সূর্যের মত রবীন্দ্রনাথের গায়ে রাজনীতিক বিতর্কের কুৎসিত উল্কি এঁকে দেন, শরৎচন্দ্রকে গাল পাড়া হতে থাকে 'ফিউডাল' বলে এবং সাতান্তর সালে অশ্রুকুমার সিকদারের মত সমালোচক অক্লেশে, চক্ষুলজ্জার একরকম বালাই না রেখেই প্রকারান্তরে ইঙ্গিত দেন যে শাসকশ্রেণীর রাজনীতির আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ধন্য হবার জন্যই নাকি তারাশঙ্করের মতো লেখকের পক্ষে সাহিত্যিক জীবনের ঐসব পারিতোষিকগুলি এত সহজলভ্য হয়ে গিয়েছিল। সমালোচনায় এইভাবে গোচরে অগোচরে কখনও বা একটি বৃহৎ রাজনীতিক বিশ্বাস কখনও বা আরও কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে একটি দলীয় বিশ্বাসেরও প্রতিধ্বনি হতে থাকে—আমাদের বাংলা সাহিত্যে ভালোয় হোক বা মন্দয়—গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরেই তা ঘটেছে—শাসক এবং বিরোধী দলে উভয়তই। সেই শ্রেণীগত বর্গীকরণ যতই অসাহিত্যিক হোক না কেন, আমরা তখন সকলেই প্রায় পদ্মবনে মত্তহস্তী।

আলোচনার শুরুতে অতঃপর অভিযোগ বা মূল্যায়ণগুলি মিলিয়ে নিতে পারি।

যেমন সুভাষের লেখায় বিষয়ের একদেশদর্শিতা, আর এই একদেশদর্শিতাহেতু তাঁর কবিতায় প্রকৃত কাব্য সম্পদের অপ্রতুলতা, যেহেতু জীবনের বৈচিত্র্যকে পাশ কাটিয়ে এক বিশেষ আশাবাদই তাঁর কাব্যে প্রশ্রয় ও প্রাধান্য পায়।

বিষ্ণু দে, সমর সেনও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মননের পরিপ্রেক্ষিতেই কবিতা রচনা করেছেন। সে বিশ্বাস এবং মননের একমুখীনতার কথা অনেকেই স্বীকার করবেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বাবুর মতো রসিক পণ্ডিত এইরকম পরিস্থিতিকেই হয়ত বলতে চেয়েছিলেন আদর্শবাদীর বিভ্রান্ত—অর্থাৎ সরলরৈখিক ছক বাঁধা জীবনে আপ্ত-

বাক্যের মতই পরম পরিণতিকে পাবার সাধনা। এ হল আশাবাদের চড়া রং-ফলানো জীবন। এ জীবনকে মানুষ চিরকালই নানাভাবে কল্পনা করেছে, প্রার্থনা করেছে।

স্বপ্নের রংদারি বিষ্ণু দে'র কাব্য কবিতায় পুরোমাত্রায়ই আছে। সমাজবিপ্লব মার্কস-লেনিন নির্দিষ্টপন্থার হলে পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে উঠবে, কূপমণ্ডুকের জাতীয়তাবাদের স্থান নেবে আন্তর্জাতিক বা সর্বজাতিকতা এরকম বিশ্বাস তাঁর অবিরল। কিন্তু এ কথাও বলতে হয়, পরিণামী বিচারে যে স্বপ্ন-বিশ্বাসই তাঁর বড়ো হোক না কেন, মধ্যবিত্ত মনের নানান আবর্ত, গলিঘুঁজি সময় বিশেষে হতাশা কখনও বা প্রসারিত আকাশকেও তিনি যথোচিত বৈচিত্র্য সমেত ধরেছেন। ফলে বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতা কখনও প্রচারপুস্তিকা বা ইস্তাহারগোত্রীয় কিছু হয়নি। সমর সেনে অবশ্য নৈরাশ্য, নির্বেদ বা একধরণের অমেরুদণ্ডী প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটিরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। এক হিসেবে তাঁর কবিতাও একদেশদর্শী যেহেতু কবি কখনই পরিত্রাণের স্বপ্ন দেখতে পারেন না, বাস্তবই শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী—সেই হেতু বাস্তব থেকে সত্যে পৌঁছোনোর ঠিকানা হয় তাঁর কাছে অলীক নয় তিনি জানেন না। ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ বিষ্ণু দে'র ক্ষেত্রে আমার বাইরে থেকে আরোপিত বলেই মনে হয়—যেহেতু তা সাবেক বা সমকালীন বাংলা কবিতার ধারা থেকে আসেনি। এক্ষেত্রে সে সময়ের ইংরেজী কবিতার প্রভাবের কথাই স্বীকার করতে হয়। আরও সংক্ষেপে বলতে হয়, দেশজ ঐতিহ্য রক্ষার দায় দায়িত্ব এলিয়টই চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনা সূত্রে এ কথাগুলি অবশ্যই বলে নিতে হয় অন্যথায় তাঁর স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করতে কিছুটা অসুবিধে হওয়ার কথা।

মার্কসীয় রাজনীতিক তত্ত্বকে এত সহজ সারল্যে বিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে দিতে সুকান্ত-সুভাষের মত কেউ পারেননি বলেই মনে হয়। সুকান্তের তো অকালমৃত্যু কিন্তু পরিণত বয়স অবধি সেই সরল বিশ্বাস আর স্বপ্নকে রক্ষা করেছেন বা করতে পেরেছেন বলেই হয়ত বা সুভাষের বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ, কবিতার বিষয়বস্তুতে বিত্তহীনতার কটাক্ষ। স্বপ্ন শুধু সাধারণ মানুষ দেখে না, উন্মাদেও

দেখে—সেইজন্যই কি।

বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যের কিছুটা স্বল্পতা আছে একথা যেমন সর্বৈব সত্য, সেই সঙ্গে ঝলমলে জীবনপ্রাচুর্যও। এত জীবনপ্রাচুর্য রবীন্দ্রউত্তর কবিদের মধ্যে সত্যিই দুর্লভ ঘটনা—যেহেতু 'না' দিয়েই, 'না'-এর কেন্দ্র থেকেই তাঁদের যাত্রা শুরু। শেষ যেখানে করেন সেখানে হ্যাঁ এবং না-এর হয় দোদুল্যমানতা নয়তো কাটাকুটি বা আধফোটা বিস্ময় চিহ্নের আবির্ভাব। উপনিষদের ভাবরসে স্নাত কবি যেমন করে বলতে পারতেন—'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'—নোতুন দর্শনে, প্রত্যয়ে দীক্ষিত উদ্‌জীবিত এই অপরাজেয় মানসিকতা কবি সুভাষের ক্ষেত্রেও একধরণের আনন্দবাদী জীবনধর্মেরই অনুবর্তন ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। সমাজতান্ত্রিক আশাবাদ এবং ঔপনিষদিক আনন্দবাদ নিশ্চয়ই এক বস্তু নয়;—'ঐ মহামানব আসে/দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে' বলে বিশ্বাসের নিদারুণ ক্ষয়ের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের উত্থানের স্বপ্ন দেখেন, শুধু তাই নয়, 'উদয়শিখরে' 'মা ভৈঃ' রবও যেন শুনতে পান। এইরকম সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবিও ভবিষ্যতের যে বাসযোগ্য পৃথিবীর ছবি এঁকে তোলেন পরিণামী বিচারে তা ভিন্ন কিছু নয়। যে পথেই হোক না কেন, মানুষের সমূহ সাধনার প্রবর্তনাই হলো পৃথিবী যেমন আছে তার থেকে তাকে বদলে দেওয়া, হতমান ন্যুব্জ বাস্তব থেকে উন্নত উজ্জ্বল সত্যে পৌঁছোনো। সুভাষ তার বিপরীতে নেই।

যদি আলোচকের কথামত এমন ধরেও নেওয়া যায় যে সুভাষ কবিচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে একদেশদর্শী তাহলেও কিন্তু কবিতার পাঠভিত্তিক আলোচনায় এরকম একটা মনে হওয়ায় বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে সেই তথাকথিত একদেশদর্শিতা সরল স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র অঙ্গীকারেরই সমার্থক শব্দ। সারল্যের নির্ভীক যৌবনের সেই সাহস আর সংকল্পকে অস্বীকার করবে কে! অস্বীকার করলে জীবনকেই তো উপেক্ষা করা হয়। যে রাজনীতিক পরিভাষাতেই সেই জীবনকে চিহ্নিত করা হোক না কেন। তাই কবি যখন বলেন—

প্রান্তিক লোভে পরজীবীদের নিষ্ঠুর চোখ
প্রাকপুরাপিক গুহাকে ডাকলো ক্ষুরধার নখ,

কমরেড, আশু অশ্বের ক্ষুরে আনো লাল দিন
দম্পতিরাত ততদিন হোক উৎসবহীন।২

বা,

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার—
আত্মদানের; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার।৩

তখন চলিত রোমান্টিকতার বাতাবরণ বিদীর্ণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির যান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ লাগলেও ('দম্পতিরাত ততদিন হোক উৎসবহীন') লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দুরন্ত পদপাতের যে সুন্দর প্রাণোচ্ছল মুহূর্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মূল্যকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশই নেই। জীবন অভিজ্ঞতা কবিতাকে কতখানি স্বচ্ছন্দ করে তোলে জেল ফেরত সুভাষের কবি মনই তার প্রমাণ। এ আরামচেয়ারের রাজনীতি বা বৃহৎবচন নয়, এক সময়ে তিনি জীবনের মধ্য থেকেই এই সংকল্পকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আবেগপ্রাবল্য নক্সালের মধ্যেও বিদ্যমান। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিচেতনায় সেই আবেগপ্রাবল্য তো আছেই, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনায়াস বৈদগ্ধ্য। অনায়াস বলেই এই বৈদগ্ধ্য কখনও পাঠককে পীড়িত করে না।

এই অনায়াস বৈদগ্ধ্যের সূত্রেই জন্ম নেয় এক চমৎকার উজ্জ্বল হালকা মেজাজের অনুষঙ্গ। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে কাব্যসম্পদ তথা বিষয়বস্তুতেও তা লঘুভার। আসল কথা হলো কবি লঘু চালে তা পরিবেশন করছেন। ব্যঙ্গের মধ্যে কবি গভীর জীবন এবং সমাজ মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেছিলেন—বাঙালী বড় বেশি অনুচিত রকমের 'জ্যাঠা', লেখায় আলোচনায় তার প্রসন্নতার প্রকাশ ঘটে না—এ মন্তব্য নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ-বিপ্লবের মত জীবনান্তিক উদ্‌যোগেও যে সুভাষ মনের এই তির্যক বৈদগ্ধ্যকে জাগিয়ে রেখেছেন, অবিরল বলিদানের মন্ত্রপাঠ করেননি, সে কথাও ভাববার। রাজনীতিক তত্ত্ব এবং বিশ্বাসকে এইভাবেই তিনি জীবনমুখী, জীবনের মধ্যে থেকে পাওয়া ব্যাপার করে তুলেছেন। এই তির্যক লঘু-তরল বৈদগ্ধ্য বিষ্ণু দে'র মধ্যেও আছে। কিন্তু পাঠকের কাছে তা এত অনায়াসলব্ধ

সামগ্রী নয়। অনেকটা পড়া এবং জানার বন্ধুর পথ পার হয়ে সেখানে পৌঁছোতে হয়। সুভাষ সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সরল। দুটি উদাহরণ দিই। দুটিই বহুশ্রুত, বহু পঠিত—

"অস্ত্র মেলেনি এতদিন; তাই ভেঁজেছি তান
অভ্যাস ছিল তীরধনুকের ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলব : বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।
চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান।"৪

'বিকেলে মসৃণ সূর্য মূর্চ্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবেনা।
সাম্য অতি খাসা চিজ!—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ!'৫

সুভাষ কাদের বিদ্রূপ করছেন! বিপ্লবী মোড়কে ছেলেখেলাকে নাকি তত্ত্বর্ষ অথচ প্রকৃতই বিপ্লব বা সংঘর্ষসংকুল পথে সমাজ পরিবর্তনে যারা ভয় পায় সেই আমাদের মত ভীরু শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত মনকে।

অনেকে মনে করছেন এই আপাত লঘু-তরল ভঙ্গীটি অচল। শুধু ব্যঙ্গে পুরোনো জীবনকে নির্মূল করা যায় না। তার পাশাপাশি নোতুন সমাজের লোভনীয় সুস্থ ছবিটিও আঁকতে হবে।৬ এ কেমন কথা! আসলে এইসব আলোচকেরা অজ্ঞতাবশতাই এসব কথা লেখেন। মনে রাখতে হবে সমাজ বিপ্লবের পথে সাম্যবাদে পৌঁছোনো সত্তেও একথা সুভাষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেও এবং কবিতার তার পর্যাপ্ত প্রতিফলন ঘটলেও মূলত তিনি কবি, তাঁর আবেগ সংকল্প এবং স্বপ্নকে তিনি রূপ দিচ্ছেন কবিতা নামক একটি শিল্পপ্রকরণের মধ্যে দিয়ে। সেই শিল্পপ্রকরণেরও একটা নিজস্ব আছে, নিজস্ব দাবী আছে। সাহিত্যের কলাবিদ্যার শর্ত মেনেই তাকে সিদ্ধি পেতে হবে। আর সমাজ পরিবর্তনে কবি শিল্পীর অন্যতম ধারালো অস্ত্র যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এ তো প্রতিষ্ঠিত সত্য। বার্নার্ড শ'কে সম্বোধন করে প্রমথ চৌধুরীর লেখা সেই কবিতা কি আমাদের মনে নেই যেখানে তিনি বলেছিলেন—

'এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।'

সাম্যবাদী কবি নোতুন সমাজের লোভনীয় সুস্থ ছবি আঁকবেন এ কথাটায়ও কিছু আপত্তি করা উচিত। প্রথমত সাহিত্য শিল্প কবিতা এরকম ফরমায়েসী জিনিস হতে পারে না। আর তাছাড়া কবি বর্তমানকে নিন্দে করতে পারেন, তাঁর দৃষ্টি বা চলার গতি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু যে সমাজ তৈরীই হয়নি, অন্য দেশের মডেলে তৈরী হলে তার সেই সম্ভাব্য রূপ কেমন হবে সে ধারণাও যখন একরকম অস্বচ্ছ, তখন সে সমাজের লোভনীয় সুস্থ রূপের ছবি তিনি কেমন করে এঁকে তুলবেন। তিনি তো আর রূপকথার রাজ্য বা সব পেয়েছির দেশের গল্প করতে পারেন না। করলে সেটাই হবে একটা সুলভ অতএব উপেক্ষা করার মত ব্যাপার।

সমালোচকেরা শুধু বলবার জন্য যাই বলুন না কেন, সুকান্তের মত, কখনও বা বিষ্ণু দে'র মত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও বলিষ্ঠ জীবন আর সঙ্কল্পের ছবি অবিরল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার আগ্রাসী ফ্যাসিবাদকেও তিনি তাঁর ঘৃণা জানান উচ্চকণ্ঠে। একেবারে ধ্বংস আর মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ঝুলন খেলতেও তাঁর যেন আপত্তি নেই।

জাপানী আগ্রাসনকে ধিক্কার দিচ্ছেন কবি, সেই সঙ্গে তাকে ধ্বংস করতেও আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি—

'জাপ পুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি জ্বলে হাঙ্কাও
কমরেড আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।'৭

বা মৃত্যুর সঙ্গে অভিনব ঝুলন—

'বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে
মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'৮

এ ঠিক রবীন্দ্রনাথের প্যারডি নয়, প্রাণের মহৎ মূল্য যে বিপর্যস্ত এ কথাই কবি এখানে বলেছেন।

সংকল্প প্রতিবাদ আর সাম্ভাব্য জীবনের ছবি—

'চলোনা কবি মিছিলে মিশি—
অসৎ ঋষিসঙ্গ
পতনে পথ করেছে ঢালু
গড়েছে বালু সৌধ।
আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি,
খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি
কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয়ঝড়ে অন্ধ।'৯

বা,

'আমি আসছি—
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙীন উদ্যত করেছো কে? সরাও।
বাধার দেয়াল তুলেছো কে? ভাঙো।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আসছি
দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি।'১০

সেইসঙ্গে

'দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি লাল টুকটুকে দিন।'.১

একটু আগেই যা বলেছি সেইটিই আর একবার বলি অর্থাৎ উচ্ছল উজ্জ্বল বলিষ্ঠতা এইসব কবিতার প্রধান সম্পদ। বিশ্বাসী মানুষের মর্মেও এসব পঙ্‌ক্তির নিহিত ভাব বা আবেগ পৌঁছে যায় অতিক্রান্ত এবং অব্যর্থভাবেই। বিষ্ণু দে'র অতি তির্যক শক্ত বহু শাখায়িত বৈদগ্ধ্যের কিছুটা আরোপিত রূপ যথেষ্ট শিক্ষিত পাঠকের অনুভবেও এত দ্রুত কমিউনিকেশন সৃষ্টি করতে পারে না। এক্ষেত্রে

সুভাসের সিদ্ধি সত্যিই বলবার মত। যদিও 'লাল টুকটুকে দিনে'র ছক বাঁধা স্বপ্নের গড়ন নিয়ে শতাব্দীর প্রান্তে একটু অবিশ্বাসী হাসি তামাশার রোল উঠতেই পারে, যেহেতু ঠিক এই মুহূর্তে সাম্যবাদের একটু পশ্চাদপসরণের অবস্থা। তবে ইতিহাস থেমে নেই। তা দ্রুত চলনশীল। সুতরাং ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কি রহস্য ঝাঁপবন্দী করে রেখেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

॥ দুই ॥

যাঁরা বলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আধুনিক জীবনের জটিল রূপের ছবি নেই তাঁদের কথার বিপরীতে আরও কিছু সাহিত্যিক অসাহিত্যিক কথা বলতে হয়। যেহেতু জীবনের জটিল রূপের চিত্রায়ণের ব্যাপারে সাম্যবাদী কবিদের পরিত্রাণপন্থা নির্দেশের ব্যাপারে একধরণের প্রবণতা থেকেই যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লেখকও তাঁর 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ'-এ এই প্রবণতা থেকে একেবারেই মুক্ত হতে পারেননি। এরও অবশ্য পূর্বসূত্র আছে। সেই পূর্বসূত্র একটি রাজনীতিক প্রতিপাদ্য। সেটি এইরকম: সমাজে ধনী এবং নির্ধন ছাড়া আর কোনও শ্রেণী নেই; বুর্জোয়া সভ্যতার এক সময় হ্যাঁ-বাচক ভূমিকা থাকলেও এখন তা নঞর্থক এবং ক্ষয়িষ্ণু; শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেছে; শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমজীবী সর্বহারার হারাবার কিছুই নেই; সশস্ত্র পন্থায় সমাজবিপ্লব হবেই এবং তাতে সর্বহারা শ্রেণীরই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, বিরাজ করবে শ্রেণীহীন সমাজ; এখনই না হলেও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র পুলিশী ব্যবস্থা অবলুপ্ত করে জন্ম নেবে এক আদর্শ সাম্যবাদী (কমিউনিষ্ট) সমাজ; মানুষের সংগ্রাম অবশ্য থেমে থাকবে না, বরং যা এতকাল নিয়োজিত ছিল পীড়ক মানুষের বিরুদ্ধে এবার তা ব্যবহৃত হবে প্রতিকূল প্রকৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে—এ এক নোতুন জীবনসংগ্রাম।

অতএব জটিলতার কাছে মাথা নীচু করা নয়। যাকে জটিলতা বলে মনে করা হচ্ছে তা জীবনেরই এক হতমান রূপ। তা প্রত্যক্ষ বাস্তব। কিন্তু এই হতমান রূপের উৎস হল চারিদিকের ক্ষয়িষ্ণু এক ধনবাদী সভ্যতা। সমস্ত শক্তি এই সভ্যতার বিরুদ্ধে সংহত করতে পারলে তবেই এই ক্ষয় আর অসম্মানের অবসান।

বদল করতে হবে উৎপাদন সম্পর্ককে, রুদ্ধ করতে হবে উদ্ধৃত্ত অর্থসৃষ্টির পথকে, তবেই সম্ভব হয়ে উঠবে নোতুন কালের আলো ঝলমল নোতুন মানুষ।

প্রাথমিকভাবে এই ছকই দীনেশ দাস, সুকান্ত-সুভাষের মত কবিকে সৃষ্টি করে তুলেছে। বিষ্ণু দে বা সমর সেনের মত কবিদেরও বাদ দেওয়ার অবকাশ নেই, যদিও 'আনতে চলেছি লাল টুকটুকে দিন' এমন সহজ সরল বিশ্বাস সমর সেনের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বলতে পারছি না, তবে কবিতায় কখনই পরিণামী মুখরতা অর্জন করেনি।

সুভাষের কবিতায় জীবনের জটিল রূপের তেমন পরিচয় নেই বলে যাঁরা অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়েই নিরস্ত হন, তাঁদের কিন্তু চারের দশকের এই বিশেষ এবং অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ প্রেক্ষাপটটির কথা অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

স্বাভাবিক ভাবেই কবি এক্ষেত্রে এগিয়েছেন নিজস্ব ঢং-এ। এবং সে ঢং-ও যত দিন গেছে ততই পরিবর্তিত পরিশীলিত হয়েছে। বিশুদ্ধ মানবধর্মের দোলাও সেখানে লেগেছে। নিজেকে তত্ত্বমাত্র-হিসেবে উপস্থাপিত না করে এই কারনেই তিনি অনেকের কাছে অনেক বেশি পরিমানে জীবন্তরূপে দেখা দেন। যদিও তাঁর যৌবনে বলিষ্ঠ জীবনের যে ধ্রুবপদ তাঁর রক্তে সংস্কারে মিশে গিয়েছিল তাকে সরিয়ে রাখার কোনও প্রশ্নই আসে না। কয়েকটা উদাহরন দেই :

'এই অন্ধকারে সেই বীভৎস মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি—
একদিন কথা দিয়ে যারা আমাকে ভুলিয়েছিল।
জিঘাংসার যে নামই তারা দিক,
যুদ্ধকে যে পোশাকই তারা পরাক,
মৃত্যুর কোনো রমনীয় নামে
আর আমি ভুলছি না।
আসমুদ্র হিমাচল
আমার বিশ্রামের জমি।
আমাকে কথায় ভুলিয়ে
সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'১২

দেশপ্রেমের আলোয়, মাতৃভূমি রক্ষার প্রেক্ষিতে আপ্তবাক্যের মত গাওয়া

পুরোনো অথচ পবিত্র তত্ত্বকথার তথা আদর্শেরই যেন অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে। সত্যের নোতুন অগ্নিশুদ্ধ মূর্তিকেই কবি মহার্ঘ সামগ্রী হিসেবে পেয়েছেন। না হলে উদ্ধৃত বক্তব্যের শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি তিনি লিখতে পারতেন না যতই প্রতিকূলতার মুখোমুখি তাঁকে হতে হোক না কেন।

এই রকম বিশ্বাসের পুরোনো স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে তিনি লেখেন :

'বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা—
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত।
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনদিনই জানব না।'১৩

আপাতদৃষ্টিতে এখানে এক রহস্যময়ী নারীর রোমান্টিক আলো-আঁধারির অস্পষ্টতার তুলুনি। কিন্তু কবি তাঁর সত্যলব্ধ হৃদয়ক্ষতকে উন্মোচিত করেন, 'আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত' বাক্যাংশটি লিখে। কবি সমাজতান্ত্রিক চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের রক্তাপ্লুত সংঘর্ষ এবং সংকটের প্রেক্ষাপটের এধব কথা বলেন। 'তার মুখচ্ছবি কেমন/কোনদিনই জানব না' বাক্যবন্ধে এই সংকট পরিস্রুত হতাশা-কেই বাঙময় করে তোলেন। সাতচল্লিশে প্রয়াত সুকান্তের কবিতায় এই হতাশার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না (সুকান্তের ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্য হতাশার মেঘ জমে উঠছিল, চিঠিপত্রে তার প্রমাণ আছে), কিন্তু বাষট্টির পরে চীন-ভারত সংঘর্ষের পটভূমিকায় সুভাষের পক্ষে তার কাছে ধরা না দিয়ে যেন উপায় ছিল না। বিষ্ণু বাবুরা ব্যক্তিগত জীবনে যে ধারণারই পরিপোষকতা করে থাকুক না কেন, প্রকাশ্যে কাব্যচর্চায় তাকে কবুল করে ফেলার মত নির্বোধ কখনই হননি। সমালোচকেরা এই সংকটের অকপট উন্মোচনকেই গাল পাড়েন 'সহজ মানবতা-বাদের ভ্রান্ত রূপ' বলে। সম্ভবত এই 'সহজ' শব্দটি 'সুলভ' শব্দেরই সমার্থক।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত : যেমন—

'চেনা মুখগুলোও
এই অন্ধকারে আমি চিনতে পারছি না।'১৪

বা,

'হাত মুঠো করছি
আর খুলছি।
মুঠো করছি আর খুলছি।
যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না সে।'১৫

জীবন তিক্ত হোক, জটিল বা জ্বালাময় সে সবই জীবনের অংশ—জীবন তার চেয়ে বড়ো, অমিয় চক্রবর্তী যেমন 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন' এ হতভাগ্য কেরাণীর বচনে কি কি শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না তার তালিকা দিয়েছিলেন সুভাষও তেমনি খুঁজে নেন আশ্রয়, গোচরে অগোচরে যে আশ্রয়ের স্বপ্ন আমরা প্রত্যেকেই অবিরত লালন করে চলি, অন্তথায় অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই হয়তো আত্মহনন একমাত্র বাস্তব হয়ে দেখা দিত। 'কাল মধুমাস' কাব্যের 'শূন্য নয়' কবিতাটি পাঠক ভাবতে পারেন যেখানে কবি বলেছিলেন—

'শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়, চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর, আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে, দুই তীর নিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে। জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি অথচ জীবন তার চেয়ে ঢের বড়ো, ঢের ঢের বড়ো, শিশির বিন্দুর শান্তি ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে হাত নেড়ে বলে : বাঁধো নীড় বাঁধো; লাবণ্য একবার তুমি তাকাও আকাশে।'১৬

একে সরলীকৃত কোনো সম্ভাব্য পরিত্রাণ ভাববো না কোনো ভাবেই। জীবনের এই ইতিবাচকতায় আশ্রয় এবং আস্থা মহৎ শিল্পী মাত্রের চেতনারই ধ্রুবপদ। ছকের দিকে ঝোঁক তাঁর অবশ্যই ছিলো, তাতে সত্যি কথাও অনেক বলেছেন, কিন্তু বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এও বুঝেছেন যে ছকে সব সত্যি আঁটেনা, সে সত্যের প্রবক্তা গান্ধীজী বা লেনিন যিনিই হোক না কেন। চীন-ভারত সংঘর্ষ যেমন কবির অনেক পুরোনো অভ্যস্ত বিশ্বাসের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিয়েছিলো। 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা'১৭ বা 'ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাচ্ছে দেখ,/ল্যাম্পপোস্টে/দেখ, ফাঁসি যাচ্ছে/পুরনো

বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই'১৮—ছক মাফিক সমাজবিপ্লবের প্রতিজ্ঞা বা নেহরুকে বিদ্রূপের চারদশকী ঢং তাঁকে পালটাতেই হতো। একই বিশ্বাসের অক্ষয় স্বর্গ কোনো জীবন্ত মন বা মানুষের পক্ষে সত্যি হয় না। আগেই বলেছি, এর কারণ তত্ত্বের থেকে জীবন বড়ো। যদিও অনেককাল আগে পাওয়া বিশ্বাসের সঙ্গে একেবারেই বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে এ কথাটাও ঠিক নয়। তাই—

'ঠিক তেমনি দূরে
কত দূরে ঠিক জানিনা,
আজও দেখতে পাচ্ছি—
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।'১৯

ধরণের বিশ্বাস কেমন যেন কোনো না কোনো ভাবে থেকে যায় যদিও নানান আবর্তের আঁকিবুঁকি চলতেই থাকে। মার্কসবাদের যে রূপ তিনি বাঞ্ছিত সত্য বলে মনে করেন ভাবেন, দলবদ্ধতাকে পাশ কাটিয়ে তার অন্বেষণ রূপায়ণ এই ভাবেই থাকে অব্যাহত। জীবনের জটিলতার আলোচনা বা ধারণা অন্তত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই করতে হবে।

জীবনের পরিণামী মঙ্গলবোধে ইতিবাচকতায় আস্থা আমরা অন্যপথের পথিকদের ক্ষেত্রেও দেখেছি। একটু অতিকথনের মতো শোনালেও তা বলি। তাতে দেখব মার্কসবাদী সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং একেবারেই অমার্কসীয় রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ভাবুক দৃষ্টিও সেই পরম সদর্থকতায় সমর্পিত। গোত্রে-গন্ধে ভিন্নতা আছে, তাই স্বাভাবিক; কিন্তু যে বিশ্বাসে মানুষের বেঁচে থাকা, বাস্তব থেকে সত্যে পৌঁছোনোর যে আকাঙ্ক্ষা সেখানকার নিশ্চিত প্রবর্তনায় ভিন্নতা নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'মঙ্গল' ধারণাটির মূল কথা হলো বৃহৎ বিশ্বসংসারের সঙ্গে যোগ। জগতের মধ্যে প্রবাসী হলে চলবে না। এর মধ্যে 'শিব' এবং একধরণের নৈতিকতার উপস্থিতির কথাও ভাববার। আধুনিক লেখকের কাছে মঙ্গলের বিপরীতে যে অমঙ্গল তার সমার্থক শব্দ—'সেন্স অফ এভিল'। 'এভিল' বলতে

পাপ এবং দুঃখ-কষ্ট দুই-ই বোঝায়। মঙ্গল বলতে কবিগুরু অবশ্য ঠিক পুণ্য আর সুখকে বোঝেননি। এ মঙ্গল আনন্দপরিণামী, কিন্তু সে আনন্দে বৈষয়িক প্রাপ্তি বা সুখ নাও থাকতে পারে। কিন্তু তা সহিতত্ব-ই, জগৎ সংসারের সঙ্গে হৃদয় এবং মননের অদ্বয়বন্ধন—সৃষ্টিস্থিতির কেন্দ্রীয় প্রবর্তনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আন্তরিক উদ্যম-প্রযত্ন। সাহিত্য তো শেষত এইসব কথাই বলবে।

এক অর্থে এ রোমান্টিকতারই উত্তরাধিকার। কীট্‌স্ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় শরৎচন্দ্র এমনকি রবীন্দ্র-উত্তর অনেক কবি-কথাকারই জগৎ সংসারের নঞর্থক অন্ধকার দিক সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবহিত থেকেও তাকেই শেষ সত্য বলে বিবেচনা করেননি। সামান্য পিছিয়ে বলি—বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ দুজনেই বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মের কঠোর তপস্যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড় থেকে প্রাণমনের দিকে, অশুভ থেকে শুভর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বন্দ্ব আছে, বিরোধ আছে, কিন্তু তাই একমাত্র নয়, সেখানে শেষও নয়। সমস্ত দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে দিয়েই যে শুভের পদসঞ্চার রবীন্দ্রনাথ তাকেই পরম ভালো বলেন—

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো আমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো আমার ভালো।'

বিরোধ অন্ধকার বাস্তব। কিন্তু বড়ো শিল্পী জীবনরসিক তাকেই পরিণামী স্বীকৃতি দেন না। মার্কস-লেনিন-গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ বা টলস্টয় কেউ-ই নন। আগেই বলেছি এ মঙ্গল উপস্থিত কোন নগদপ্রাপ্তি নয়, এ মঙ্গল সামঞ্জস্য। বৃহত্তর অর্থে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে। তাৎক্ষণিক লাভ মহাত্মার মৃত্যুর মতও হতে পারে। যদিও প্রসারিত অর্থে সে আত্মদান অবশ্যই প্রতীকী, মহৎ সংগ্রামের। মোট কথা এক কঠিন বেদনাযুক্ত সৃষ্টিকর্মের নিরবধি প্রবাহই সত্য। তা কঠিন এবং বেদনাযুক্ত যেহেতু বর্তমানের নঞর্থকতাকে পার হয়ে যাবার অঙ্গীকার তাতে ওতপ্রোত। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তের সেই বিখ্যাত রবীন্দ্রকবিতায় যেমন ছিলো—

'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,

চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম।'[২০]

মোটকথা সাহিত্যকে জীবনকে বাইরের বিপুল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে তার কোটি হীনতার মধ্যে নিত্য বা ধ্রুব ধর্মেই ভাবতে হবে—আরও তদ্গতভাবে দূর-প্রসারী ও ভারসাম্যযুক্ত দৃষ্টি ও পরিপ্রেক্ষিতে। সেই নিত্যধর্মের সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, এক পরিণামী মঙ্গলবো ধগূঢ়তর অর্থে-ই শ্লিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য প্রত্যক্ষ বাস্তবের সীমানা পার হয়ে সেই হলো অভিলষিত সত্যের এলাকা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তত্ত্ব ও জীবনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কথা হয়তো একটু বেশীরকমের বড়ো মনে হতে পারে। কিন্তু এ তুলনা বা প্রতিতুলনার একটাই উদ্দেশ্য। তা হলো জীবনশিল্পী যেমন একদিকে কোনো ছককাটা তত্ত্বে বাঁধা পড়তে পারেন না, অন্যদিকে মানুষ যে শেষপর্যন্ত সদর্থক অর্থে-ই বিজয়ী হবে, জীবন হবে সুষম 'সংগতি'পূর্ণ এ বিশ্বাসকেও ধ্রুবপদের মতো করে নেন। তত্ত্ববিদীর্ণ জীবন এবং জীবনপরিস্রুত ভবিষ্যতের বর্ণময়জীবনের প্রত্যাশা—মহৎ শিল্পীর চেতনাপ্রবাহের এই হলো গতিপথ। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিস্বভাবের ক্ষেত্রে শেষত তার কোনো অন্যথা ঘটেনি।

☐ প্রসঙ্গ উল্লেখ :

১. আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—ডঃ আশিস দে ও শ্রীমতী শিপ্রা দে।
২. চীন : ১৯৩৮—পদাতিক
৩. দীক্ষিতের গান—চিরকুট
৪. প্রস্তাব : ১৯৪০—পদাতিক
৫. নির্বাচনিক—পদাতিক
৬ আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা—বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

৭. চীন : ১৯৩৮—পদাতিক
৮. পদাতিক—পদাতিক
৯. কাব্যজিজ্ঞাসা—চিরকুট
১০. আমি আসছি—ফুল ফুটুক
১১. লাল টুকটুকে দিন—ফুল ফুটুক
১২. এই জমি—কাল মধুমাস
১৩. পোড়া শহরে—যতদূরেই যাই
১৪. বন্ধু—কাল মধুমাস
১৫. সকালের ভাবনা—কাল মধুমাস
১৬. শূন্য নয়—কাল মধুমাস
১৭. সে দিনের কবিতা—পদাতিক
১৮. খোলা দরজার ফ্রেমে—কাল মধুমাস
১৯. এখন ভাবনা—ফুল ফুটুক
২০. শেষ লেখা—রবীন্দ্রনাথ।

অশোকবিজয় রাহার আরণ্যক-সত্তা

শীতল চৌধুরী

কবি অশোকবিজয় রাহা ছিলেন মূলত সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্যপরিপুষ্ট নিসর্গ-সচেতনতাই তাঁর কবিতায় চলচ্চিত্রের মতোন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও অচিরে কিন্তু তিনি নিজস্ব নিসর্গ-সচেতনতায় সৌন্দর্যপরিপুষ্ট এক স্বতন্ত্র কাব্যভূমি গড়ে তুলেছিলেন। এক শ্রদ্ধেয় কবি ও সমালোচক এই কবির কাব্যমানস সম্পর্কে সুন্দর কটি কথা বলেছেন, "গোত্রে ও ধর্মে অশোকবিজয় বিশুদ্ধ কবি। কাব্যভারতীর মণ্ডনকলায় যেমন রূপদক্ষ শিল্পী, বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে তেমনি ক্লান্তিহীন বাণী-ভাস্কর" ('আমার কালের কয়েকজন কবি')। সত্যিই গোত্রে ও ধর্মে অশোকবিজয় ছিলেন একজন বিশুদ্ধ কবি।

নিসর্গ-সৌন্দর্য মন্থনে সব সময় কবি যে আকুল হতেন তা তাঁর কবিতার ছত্রে-ছত্রে লক্ষ্য করা যায়। 'আকাশ' কবিতাটির শুরুতেই তা রয়েছে। প্রকৃত প্রকৃতির নিসর্গপ্রেমী না হলে কি এমন কথা কবিতাটির শুরুতেই কেউ অম্লানবদনে বলতে পারেন!—

সারাদিন শুধু ব'সে ব'সে আজ ভাবি,
ঐ যে আকাশ মেলে আছে জানালায়,
ধূ-ধূ ফাঁকা নীল একখানি খোলা মাঠ—
ঐ তো আমার বাহিরে মনখানি!

তাঁর পত্রসংকলন 'পত্রাষ্টক'-এ নিজেই বলেছেন—"আমার মধ্যে আজীবন মিশে আছে তিনটি বিভিন্ন সত্তা : একটি আদিম আরণ্যক, একটি প্রাকৃত গ্রামীণ, আর একটি বিদগ্ধ নাগরিক। এর মধ্যে আমার আরণ্যক সত্তার প্রভাবটাই বোধ করি প্রবলতম।" আরণ্যক-সত্তার প্রভাব যে কবিমানসে প্রবলতম ছিল এর মূল কারণ কিন্তু একটাই—কবির মন অধিক নিসর্গ সৌন্দর্য-পিয়াসী ছিল বলে! 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটিতে কবি-প্রেমের মধ্যে নিসর্গ প্রকৃতির রূপবিভার রঙ-জৌলুশ কিভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে কবি-মনের প্রেমকে গভীরভাবে

প্রসারিত করেছে এবং প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতির যে আত্মিক যোগসূত্রস্থাপন করে কবি-প্রেমকে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে এক অনন্য উজ্জ্বল আলোকে বিভূষিত করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। কবির আরণ্যক সত্তার প্রভাবই এখানে অধিকমাত্রায় কাজ করেছে কবির বোধ ও মননে। কবিতাটি ছোট। কিন্তু কি নিখুঁত বাঁধন যা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। কবিতাটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি—

পথের বাঁকে হঠাৎ হলো দেখা।
নীল পাহাড়ের কোলে
ঝিলিমিলি রোদের ঝালর দোলে,
সবুজ বনে পাখির কোলাহল,
আঁকাবাঁকা সবুজ নদীর জল,
সবুজ জলে রূপালি মাছ ধরছে ব'সে জেলে
সোনালি জাল ফেলে,—
হঠাৎ হলো দেখা,
মনের কোণে ঝলক দিলো রেখা।

কবিতাটিতে আগাগোড়া ছবির পর ছবি গেঁথেছেন কবি। প্রকৃতির অপরূপ রূপের বুনন নানা প্রতীক ও চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে 'ঝিমমিলে রোদের ঝালর' 'সবুজ নদীর জল', 'সবুজ জলে রূপালি মাছ', সোনালি জল' ইত্যাদি। এসব প্রতীক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি সহজ-সরলভাবে নিপুণ চিত্রকরের মতোন অঙ্কিত করেছেন প্রকৃতির রূপবিভা। 'চিঠি' কবিতাটিতেও শিকারীবন্ধুকে লক্ষ্য করে কবি যা বলেছেন সেখানেও কবির আরণ্যক-সত্তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এই কবিতাটির মধ্যেই কবি অশোকবিজয় একই সঙ্গে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিপালিত মানুষের জীবনকে দেখেছেন। কবিতাটির মধ্যে আবার কবির একই সঙ্গে মনোবেদনার পরিচয়ও রয়েছে। প্রকৃতির সববিছুই কবির কাছে একান্ত ভালোবাসার ধন ছিল বলেই কবি তাই জ্যোৎস্নারাতে তীর-বেঁধা পাখির রক্ত-ঝরার নির্মমতাকে তুলে ধরে শিকারীবন্ধুকে 'দস্যু' বলে অভিহিত করেছেন। কবি বিবেকদংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তবু কিন্তু কবি প্রেমকে বড়ো করে দেখেছেন

বলেই কবিতাটির শেষে প্রকৃতির জ্যোৎস্নারাতের নিসর্গ-সৌন্দর্যকে স্মরণ করে বলেছেন—

আমি শুধু জানি আজ এ জ্যোৎস্না-রাতে
কত কচি ডালে ফুলের প্রসব-ব্যথা,
কুমারীর বুকে কত যন্ত্রণা দিয়ে
জন্ম নিতেছে প্রথম প্রেমের কুঁড়ি।

'ফাল্গুন' কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায় নারী ও প্রকৃতি কবির কাছে সৌন্দর্যের একই মূল্যে রূপায়িত হয়েছে। নারী-সৌন্দর্য তুলে ধরতে ধরতে তাই কবি ফাল্গুনের রূপাঙ্কনও করেছেন। কবিতাটির শেষ পাঁচ পঙ্‌ক্তিতে যা দৃশ্যগোচর—

নদীর ওপারে আকাশে আবির-ঝড়,
আলতা গলছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধূ-ধূ হাওয়া এলোচুলে,—
দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

'শিলং' কবিতাটিতেও লক্ষ্য করা যায় কবি শিলং প্রকৃতির রূপবিভার সঙ্গে পেন্সিলে আঁকা পরিকে অবলোকন করে উল্লসিত হয়েছেন। এখানেও আরণ্যক-সত্তা তাঁর কবি-মানসে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এ কারণে কবি পাইন-বীথির ধোঁয়াটে ধূসর পথের কথা বলেছেন। কবিতাটির প্রথম চার পংক্তিতেই যা নজরে আসে—

সারারাত কারা ধুনেছে মেঘের তুলা,
দূরের পাহাড় পশমের লোমে ঢাকা,
পাইন-বীথির ধোঁয়াটে ধূসর পথে
ফ্লানেল জড়ায়ে এসেছে সুপ্রভাত।

আরণ্যক-সত্তা কবি-মনে কতটা প্রবল ছিল এবং আরণ্যক-সত্তা কবি-মানসে কত গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেছে তার দু-চারটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ক'টি কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করে—

১. নাগাপাহাড়ের নিচে প্রকাণ্ড জঙ্গলে
এক প্রান্ত নড়েছে হঠাৎ
(চিরন্তনী)

২. দূর থেকে দেখছি সেদিন
ধূম্রদেহ হাফলং-পাহাড়,
অতিকায় দনুর সন্তান
লাফ দিয়ে উঠে আছে অর্ধেক আকাশে,—
কোমরে জঙ্গল গোঁজা, সূর্যের মাকড়ি জ্বলে কানে,
(পাহাড়িয়া)

৩. এই রাত পেগু-ইয়োমায়
ডাইনোসরের মতো লাফ দিয়ে উঠেছে পাহাড়ে,
সেথা হ'তে ছুটে এসে আসামের গভীর জঙ্গলে
হঠাৎ হারায়ে যায়,
(রাত্রি)

৪. ঝোপে ঝাড়ে সন্ধ্যা নামে বুনো গন্ধে মেশা,
বাঁকের মোড়েই হঠাৎ আসে রাঙা মাটির টিলা
ওর পিছনে উঁকি মারে পাহাড়টা একশিলা,
শেয়াল-ডাকা রাত্রি আসে যেই আসি ওর কাছে,
বাদুরগুলো ঝাপটা মারে কাক-ডুম্বুরের গাছে,
(একটি সন্ধ্যা)

৫. তোমার দেশে আজ এসেছি মেয়ে
এসেই দেখি বনের পাখা বৃষ্টি ঝেড়েছে
(জল ডম্বরু-পাহাড়)

৬. গাছের পাতারা
পায় কোন্ অদৃশ্য ইশারা
আমলকীবন
তুলেছে অস্ফুট শিহরণ
উচ্চকিত দেবদারুতল
মর্মর-চঞ্চল।
(স্বপ্ন-সন্ধ্যা)

৭. কিছু আরো এক গভীর রাতে তোমাকে আমি দেখেছি
এক বনের ধারে ওক গাছের ছায়ায়,
তুমি চুপ ক'রে আছ দাঁড়িয়ে,
এক পাশে ধূ-ধূ করছে জ্যোৎস্নার মাঠ
মাঠের ওপারে একটি পুরনো দুর্গের মূর্ছিত প্রেতচ্ছায়া
এপারে ছমছম করছে ঘন বন
রাত দুপুরে।
(বিদেশিনী)

তবে, মনে রাখতে হবে নারী ও প্রকৃতি দুই-ই কবির কাছে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হলেও নারীর নারীত্বকে কবি কখনো বিসর্জন দেননি। এ কারণে নারীর রূপে মহিমার সংকীর্তন করতে কবি যে কখনো ভোলেননি তা 'নাগকন্যা' কবিতাটিতেই লক্ষ্য করা যায়। নারীর স্বাভাবিক রূপ-মাধুর্য নারীত্বের মহিমায় তাই উদ্ভাসিত হয়েছে। বিশেষ করে কবি যখন বলেন—

কাজল-টানা ডাগর দু'টি চোখ,
চিকন-কালো দীঘল দেহখানি,
কাঁচল বেয়ে কুটিল বেণী নামে,
মাথার 'পরে সাপের ঝাঁপি, জানি।
ডাগর দু'টি কাজল-টানা চোখ,
সাপের খেলা দেখাও তুমি মেয়ে ?
বুকের 'পরে বেণীতে সাপ দোলে ?
নেচে বেড়ায় সকল দেহ বেয়ে ?

আবার, নারীর অন্তর উদ্‌ঘাটনও কবি করেছেন শেষ চার পংক্তিতে—

বুকে তোমার শীতল কালো সাপ,
দীঘল কালো পিছল দেহখানি,
চোখেও সাপ নাচায় দেখি ফণা—
মনেও সাপ খেলছে তোমার জানি।

'নাগকন্যা' কবিতাটিতেও কবি-মনের আরণ্যক-সত্তা প্রবলভাবে জেগে উঠেছে বলেই তিনি নাগকন্যার নারীত্বকে নাগিনীরূপেই দেখেছেন।

প্রেমের কবিতাগুলিতেও লক্ষ্য করা যায় কবি-মনে আরণ্যক-সত্তা কখনো-সখনো ঝিলিক দিয়েছে। বার-বার ঘুরে-ফিরে এসেছে নানান প্রতীক ও চিত্রকল্পে বন ও পাহাড়ের কথা। 'ডিহাং নদীর বাঁকে' কবিতাটিতে কবি যখন বলেন—

বুকে তোমার আগুন-রঙের শাড়ি
আগুন যে ধরালো,
উঠল জ্বলে পাহাড়তলির বনে
বর্ষা-ফলার আলো।

এখানে কবি-মানসের আরণ্যক সত্তার ঝিলিকের জন্য প্রেমের ইন্দ্রিয়াতীত আবেদন তীক্ষ্ণতা পেয়েছে। 'উঠল জ্বলে পাহাড়তলির বনে/বর্শা ফলার আলো' এই কথাগুলিতে কবি-মনের আরণ্যক-সত্তা জেগে উঠেছে। এরকম আরণ্যক-সত্তার ঝিলিক তাঁর বেশকিছু প্রেমের কবিতাতে বেশ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছে। কবির আত্মসচেতনতায় হোক, বা কবি-মানসের অবচেতনের ভেতরেই হোক—আরণ্যক-সত্তা কবি-মানসে উঠে এসেছে বার বার। তবে, এই আরণ্যক সত্তা ঝিলিকের জন্য তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। বরং বলা ভালো আরো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়েছে। আমাদের অন্তরের ভেতরে যে আদিম-সত্তা লুকায়িত আছে, মাঝে-মধ্যে যার স্বপ্রকাশ কখনো-সখনো ঘটে— তা কবি নিপুণ চিত্রকরের মতন তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবেকবান বিশুদ্ধ কবি ছিলেন বলেই মানুষের অন্তরে যে আদিম-সত্তা ঘুমিয়ে আছে—তা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। এড়ায়নি বলেই প্রেমের অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁর রূপায়ন করে বলা যায়, মানবজীবনের দুই সত্তাকে তুলে ধরে ভেতর-বাইরের এক দ্বান্দ্বিক অন্তর বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। এই জন্যই তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির এক অনন্য স্বাদে রসপুষ্টি ঘটেছে।

অরণ্যপ্রকৃতিকে কবি অধিক ভালোবাসতেন বলেই একটি গাছের মধ্যেই তিনি বিশ্বরূপকে অঙ্কিত করেছেন। 'মায়াতরু' কবিতায় যা স্পষ্ট লক্ষণীয়। অরণ্যপ্রকৃতির একনিষ্ঠ প্রেমিক না হলে কি এ সম্ভব? কবি অশোকবিজয় রাহা সাবলীলভাবে ছবি একেছেন রঙ ও তুলি দিয়ে নিপুণ চিত্রকরের মতন। বাংলা সাহিত্যে এ এক পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। গাছকে কবি বিশ্বরূপের নানা

প্রতীকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন তা ভাষা ও ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়। প্রতিভাবান কবি ছিলেন বলেই তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার মতন আপন সৃষ্টির আনন্দে গড়ে তুলেছেন তাঁর এই অসামান্য কবিতাটি। গাছকে কেন্দ্র করে কবি এক মায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কবিতাটি বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য বলা যেতে পারে। কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি—

এক যে ছিল গাছ
সন্ধ্যে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গরগর
বিষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠত হেসে
কোথায়-বা সেই ভালুক গেল, কোথায়-বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'ত কী যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হলো যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি প'ড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

'বন-ভৈরব' কবিতাটিতে প্রকৃতির ভাস্কর্যকে কবি অনেকটা জীবনানন্দ দাশের মতোন শব্দকে যেন ছেনি দিয়ে দিয়ে খোদাই করেছেন নিপুণ শিল্পীর মতন। এই কবিতাটিতে পাহাড়চূড়া কেটে কেটে যে বনভৈরবের মূর্তি গড়েছেন তাও কিন্তু কবিমানসের আরণ্যক-সত্তার প্রবাল্যতাকেই মনে করিয়ে দেয়। কবিতাটি মাত্র আট পংক্তির। এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটিই তুলে ধরছি—

কালানাগা-পাহাড়-চূড়ায়

বন-ভৈরবের মূর্তি ব'সে আছে আকাশের গায়।
বিশাল উলঙ্গ দেহ, বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের মালা,
স্ফটিক-নির্ঝর বেয়ে ঝরে জল কমণ্ডলু-ঢালা,
প্রকাণ্ড পাথর-ধাঁড় ব'সে আছে কী বিশাল স্তূপ,
বহু নিচে বন হ'তে কুণ্ডলিত ওঠে মেঘ-ধূপ,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে, তারপরে অন্তহীন রাত,
ত্রিশূল-চূড়ার কাছে দেখা দেয় একচক্ষু চাঁদ।

অশোকবিজয়ের কবিতায় নিসর্গলোকের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেলেও, তিনি মানুষের হৃদয়াবেগকে নিয়েও যেমন কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি যুদ্ধকালীন সময়ে অসহায় ও ভীত মানুষের অবস্থাকেও তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায় নিপুণ ভাস্কর্যের মতন শব্দ-তুলির টানে। কালচেতনা তাঁর গভীর ছিল বলেই কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

তবে, নিসর্গ-পূজারী ছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যের বিভা বার বার উঠে এসেছে। এমনকি জটিল সংসারজীবনের ছবি আঁকতে গিয়েও তিনি প্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের এক নিগূঢ় সান্নিধ্য সবসময় তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। কবির যেন মনে হয়েছে প্রকৃতিকে নিয়েই মানুষ, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাই কোনকিছুই তিনি ভাবতে পারেননি। আর যেহেতু আরণ্যক-সত্তা তাঁর কবিমনে বেশি মিশে ছিল সেই হেতু তিনি বার বার আধুনিকতার নঞর্থকতাকে তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আদিমসত্তাকে টেনে এনে বার করে দেখিয়েছেন শল্য চিকিৎসকের মতন। এমনকি ধরিত্রীর আদিম মাতৃত্বকে তুলে ধরেছেন সুনিপুণভাবে তাঁর কবিতার কটি পংক্তিতেই—

আদিম মাটির বুকে মাতৃস্তনে এসেছে অমৃত,
জীবনের যত স্বপ্ন, যত আশা, যত ভালোবাসা
এই মহাসত্য-বীজে জন্ম তার প্রথম অঙ্কুরে।

কবির শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল আরণ্যক পরিবেশে। সেই কারণে কবি আরণ্যক-সত্তাকে কখনো এড়িয়ে চলতে পারেননি। পারেননি বলেই তাঁর কবিতায় বার বার উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ঝিলিক দিয়েছে আরণ্যক-সত্তা!

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের অর্ধশতাব্দী ঃ ফিরে দেখা

সুস্নাত দাশ

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রধানত অবিভক্ত বাঙলাকে কেন্দ্র করে একটি মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। গোপাল হালদার সহ অনেক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি এই আন্দোলনকে বাঙলার দ্বিতীয় নব জাগরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

বস্তুতপক্ষে উনিশশো চল্লিশের দশকে পুরাতন ধারার শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীত-নৃত্য সাংস্কৃতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এই নবজাগ্রত বস্তুবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৩৬ সালে সারাভারত প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপিত হওয়ার পর বাঙলাদেশে বামপন্থী ও মার্কসবাদী চেতনায় দীক্ষিত প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবিরা উল্লেখযোগ্য-ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৩৮ সালে ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সারাভারত থেকে বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে একটি বাণীও প্রেরণ করেন। ১৯৩৮ সালে সম্মেলনটিকে নিঃসন্দেহে বাঙলার সাংস্কৃতির আন্দোলনের প্রথম মাইলস্টোনরূপে চিহ্নিত করা যায়। মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গবেষক সুধী প্রধান এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলন ঘটে যাবার পর আমরা দেখতে পাই, যে ছাত্ররা কলকাতার আশে-পাশের জেলায় পথনাটিকা ও গান করে বেড়াচ্ছেন। বাঙলার অনেকগুলি জেলায় প্রগতি সাহিত্যাদর্শের ভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সৃষ্টি হয় গান ও অভিনয়ের দল (সাংস্কৃতির প্রগতি, পৃঃ ১৭৭, পুস্তক-বিপণি ১৩৮৯)।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই উদ্যোগ ছিল অসংগঠিত এবং স্থানীয় ভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে ওয়াই. সি. আই নামক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর

থেকেই। (১৯৪০ সালের প্রথমদিকে কোনো এক সময় প্রতিষ্ঠিত হয়) বাঙলার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে, বিশেষ করে তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে নতুন এক সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ দেখা যায়, যার মূল প্রোথিত ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ—বিরোধিতার মধ্যে। এই কারণে ওয়াই. সি আই কে অনেকেই পরবর্তীকালে 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' এবং 'গণনাট্য সঙ্ঘ'-র 'সূতিকাগার রূপে চিহ্নিত করেছেন। ওয়াই. সি. আই-এর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিতর্ক, আলোচনা, নাট্যাভিনয়, সেমিনার ও গণসংগীত—চর্চাই ছিল ঐ সময়ে সংগঠনটির কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ। এ সবের মধ্য দিয়েই সংগঠনের সদস্যরা ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন এবং জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা। যেমন জলি মোহন কল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, উমা চক্রবর্তী, সুজাতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনেকেরই জানা নেই যে, ওয়াই সি. আই-এর উদ্যোগেই সর্বপ্রথম বাংলা তথা ভারতবর্ষে সঙ্ঘসংগীত বা গণসংগীতের ধারার সূচনা ঘটে। কিন্তু ব্যাপকতা ও প্রসারের দিক থেকে এই আন্দোলন ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ওয়াই. সি. আই-এর সাংস্কৃতিক আন্দোলন কিছুটা তরঙ্গ তুললেও যুগান্তর-সৃষ্টিকারী কোন পরিবর্তন তার দ্বারা ঘটে নি। প্রকৃত পক্ষে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যুগের সৃষ্টি হয় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই। ১৯৪৩—৪৫ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ কার্যত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখন ও শিল্পী সঙ্ঘের শাখা রূপেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়েছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের এক উত্তাল পর্বে, আর তা দানা বেঁধেছিল নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে—দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে। গণনাট্য সংঘের মুখপত্র 'লোকনাট্য'-র এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা) এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল :

"....ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিস্ট-দস্যু হিটলারের তাণ্ডবলীলা চলেছে। এশিয়ায় তার সাকরেদ তোজোর দল স্ত্রী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ সাধারণ

মানুষের রক্তে স্নান করে, একটার পর একটা দেশ গ্রাস করে বাংলার দুয়ারে উপস্থিত। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তখন দারুণ বিভ্রান্তি।....সেই দারুণ বিভ্রান্তির মাঝে পথ দেখালো এক অভিনব বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিযান। মাঠের চাষী, কলেজ মজুর আর বিপ্লবী ছাত্রের কণ্ঠে গর্জে উঠলো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের গান। সে গানের সুর ও কথা লক্ষ লক্ষ নিচের তলার মানুষের একান্ত আপনার। তাই লক্ষ কণ্ঠে সে গান ছড়িয়ে গেল কারখানা থেকে বস্তিতে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, হাটে-মাঠে-বাজারে, স্কুলে কলেজে। গানের পাশে এসে জমলো যাত্রা, পাঁচালী নাটক, লোকনৃত্য আরো কত বিচিত্র সাংস্কৃতিক রূপ। শ্রমিক, কবি ও শিল্পী রূপ দিলেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে, তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে। বিভ্রান্ত দেশকে তাঁরাই দেখালেন পথ, তাঁরাই দিলেন নতুন সংস্কৃতি, যাঁরা যুগ যুগ ধরে পদানত, যাঁদের শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে অবজ্ঞা-মিশ্রিত করুণা ও অবিশ্বাসই তথাকথিত সার্থক শিল্পী ও সাহিত্যিক মহল পোষণ করে থাকেন। সংস্কৃতিকে নিপীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রাম ও মানব-মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে জন্ম নিল 'গণনাট্য সংঘ'।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'র অন্তরালবর্তী সংগঠক ও প্রাণপুরুষ নিঃসন্দেহে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী। শিল্প-সংস্কৃতিকে গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার রূপে সার্থকভাবে ব্যবহারের কাজটি তিনিই বোধহয় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রায় পাশাপাশি প্রধানত যোশীরই উদ্যোগে বোম্বে-তে (২৫ মে, ১৯৪৩) 'অল ইণ্ডিয়া পিপলস্ থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন'-এর যে সম্মেলন হয় তার সর্বভারতীয় কমিটিতে বাঙলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ৯ জন প্রতিনিধি। এঁরা হলেন—বিনয় রায় (সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক) সুনীল চ্যাটার্জি, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জি ও দিলীপ রায়।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আই. পি. টি-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক অনিল ডি-মিলভা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র যে বাঙলা কমিটি অনুমোদন করেন তার নেতৃত্বে ছিলেন : যুধী প্রধান (সর্বক্ষণের সংগঠক) শম্ভু মিত্র (প্রযোজনা সম্পাদক) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীত সম্পাদক) ও চিন্মোহন সেহানবীশ, সভাপতি হন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

এই সময়ই স্থির করা হয় যে, 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'—নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বাঙলা শাখা রূপেই অতঃপর কাজ করে যাবে।

All India People's Theatre Conference-এর ২৫শে মে-র (১৯৪৩) উক্ত অধিবেশনে (নট ও নাট্য পরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য-র অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি। যে 'খসড়া প্রস্তাব' স্নেহাংশু আচার্য কর্তৃক উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন। উদ্ধৃত অংশ থেকে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'র খসড়া প্রস্তাব ঃ—

"ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র এই সম্মেলন মনে করে যে সারা ভারতবর্ষে গণনাট্য আন্দোলনকে সংগঠিত করা, ভারতীয় শিল্প ও নাট্যমঞ্চ-র ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করার আশু প্রয়োজন রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করার জন্য।

"আমাদের দেশের জনগণের সামনে অন্য সমস্যাগুলি হল: ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন যা আমাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির চরমতম শত্রুরূপে দেখা দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের দল যারা আমাদের হাতে মাতৃভূমি রক্ষার দায়িত্ব তুলে দিতে রাজী নয়; ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও খাদ্যাভাব যা নৈতিক ও শারীরিকভাবে আমাদের দেশের জনসাধারণকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে চলেছে। এবং দেশবাসীর মধ্যে চরম অনৈক্য। এই সমস্যাগুলির জন্যই আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দেশ থেকে তাড়াতে পারছি না, অর্থনৈতিক সংকটকে এবং ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনকে পর্যুদস্ত করতে পারছি না।

"এই কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র প্রধান করণীয় কাজ হল ভারতীয় ঐতিহ্যের শিল্পধারার মাধ্যমেই এই সমস্যাপীড়িত দেশবাসীর জীবনসংগ্রামের প্রকৃত চিত্র অংকন করা, জনসাধারণকে তাদের অধিকার রক্ষায় সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হতে অনুপ্রেরণা যোগানো।.....

"এই জন্য আমাদের সংগঠন পরিবেশিত নৃত্যগীতাদি ও নাটক যেমন উক্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হবে সেরকম সহজভাবেই সেগুলিকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে বিষয়বস্তু তারা অনুধাবন করতে

পারেন এবং সহজেই নিজেরাও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। লোক-সংস্কৃতি, গণসংগীত এবং মুক্ত মঞ্চের ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হবে।

"এক্ষেত্রে আমাদের সংগঠন বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের বিশেষ করে জঙ্গি কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সমাজের মধ্যে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণ-সংস্কৃতির (সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য) উদ্ভাবনকে সর্বদাই উৎসাহিত করতে যাতে দেশবাসী ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনকারীদের, মজুতদার-কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ও জাতীয় নেতৃত্বের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হতে পারে।

'এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করাই হবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র প্রধানতম কাজ।" [ইংরাজী থেকে অনূদিত]

১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ যখন তার কাজ শুরু করে তখন বাঙলাদেশে দুই ধরণের সঙ্কট বিদ্যমান। প্রথমটি রাজনৈতিক। অর্থাৎ, ১৯৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলনের রেশ তখনও কাটে নি। গ্রামে-গঞ্জে বিছিন্নভাবে জাতীয়তাবাদী জনতার এক বিরাট অংশ সে-সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রায়-সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। জাপান থেকে পরিচালিত সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতিও জনমানসে তীব্র আলোড়ন তুলেছে। এর বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠকেরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হচ্ছিলেন জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতার, এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছিলেন তাঁরা।

দ্বিতীয় সংকটটি ছিল অর্থনৈতিক। অর্থাৎ, ১৯৪৩-এর বাঙলায় মন্বন্তরসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামেই পরিচিত, তার মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রায় সকল কর্মী এবং বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির, সদস্যরা। মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধিতা তখন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। একদিকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন এবং অপরদিকে মন্বন্তর ও মহামারীর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সেবা করার যে ইতিহাস গড়ে তুলেছিল তৎকালীন গণসংগঠনগুলির (কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায়) কর্মীরা, তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। বস্তুত, মন্বন্তরের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির

ভূমিকাই ছিল সেই সময় অনেক বেশি উজ্জ্বল। এর ফলেই তৎকালীন মূল জাতীয় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও কমিউনিস্টরা আপামর জনসাধারণের অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

'গণনাট্য সংঘে'-র ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সীমিত আর্থিক ও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী একদল প্রগতিশীল ও প্রতিভাধর শিল্পী 'গণনাট্য সংঘে'র মঞ্চ থেকে একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ভূমিকা পালন করে চলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই ছিল 'গণনাট্য সংঘে'র মূল ভিত্তি।

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সেদিন 'গণনাট্য সংঘে'র সাংস্কৃতিক কর্মসূচী কার্যত সম্পূর্ণভাবে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। আর, একথা বলাই বাহুল্য যে, ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটের বাড়িটিই হয়ে উঠেছিল, সেই সময় এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র ও কর্মমুখর জমজমাটি এক দপ্তর।

গণনাট্য সংঘ পরিবেশিত গানের ধারা :

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র গান বলতেই বোঝায় বিনয় রায়ের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব। সে সময়ে 'জনযুদ্ধের গান' নামে গণনাট্য সংঘ ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গানের এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ওই গানগুলির প্রত্যেকটিই দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানগুলির সুর ও ভাষা ছিল অনেক বেশি পরিমাণে লৌকিক ও জনবোধ্য। এবং এই কারণে জনচিত্ত আকর্ষক। ওয়াই. সি. আই-এর সময়কার গানের সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনকালীন এই সকল গানের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। বাঙলার লোকসঙ্গীতের ধারাতেই সুরারোপিত হয়েছিল অধিকাংশ গান। বস্তুত গণনাট্য সংঘ পরিবেশিত সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল :

১) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা এবং একই সঙ্গে দেশীয় জোতদার, জমিদার ও একচেটিয়া পুঁজিপতির বিরোধিতা।

২) সংঘবদ্ধ, সংগঠিত ও উদ্দেশ্যমূলক সঙ্গীত।

৩) বাঙলার বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর, বিচিত্র ভূখণ্ডে ছড়ানো ও বিবিধ সাঙ্গীতিক আঙ্গিকে সক্রিয় এবং কৃষক শ্রেণীর গভীরে প্রোথিত দেশীয় চেতনার প্রতিবাদী শিল্পরূপ।

জনযুদ্ধের গান ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গানের প্রধান সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বিনয় রায়। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টাতেই জনযুদ্ধের যুগে এক নতুন সঙ্গীত-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ-প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের লেখা একটি নিবন্ধ থেকে এই আন্দোলন ও বিনয় রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। দেবেশ রায় লিখেছেন :

"গানের ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব দেন বিনয় রায়। তিনি প্রচলিত অর্থে গায়ক ছিলেন না, কিন্তু গান গাইবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তাঁর ছিল। আর ছিল অসামান্য কণ্ঠসম্পাদ। চল্লিশের দশকের গোড়ায় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। শ্রমিক সভায় গানও গাইতেন। নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনে বিনয় রায়ের ডাক পড়ল। তাঁকে নিয়ে তখনকার দিনের ট্রেড ইউনিয়ন এবং লেখক ও শিল্পী সংঘে'র ভেতর বেশ কিছুদিন টানাটানি হয়। শেষে পাকাপাকি তিনি সংঘে যোগ দেন।

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রধানত বিনয় রায়ের নেতৃত্বগুণেই সংঘের গানের দল স্বাতন্ত্র্য পেয়ে বেড়ে উঠতে থাকে, সংঘের ভেতরেই এই গানের দল ও নাটকের দলের স্বাধীন বিকাশ ঘটতে থাকে।

"বিনয় রায়ের টানে আর ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ারে বাদল খাঁ ভীষ্মদেবের ঘরানা এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গীতাসর থেকে সংঘে এসে পৌঁছে যান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র কবি। আর সংঘে এসে তিনি হয়ে উঠলেন প্রধান গীতিকার, প্রধান সুরকার, প্রধান গায়ক। 'নব জীবনের গান' রচনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

"এলেন শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। শুধুমাত্র নতুন নতুন গণসঙ্গীতই নয়, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ও নতুন গায়ন আবিষ্কার করলেন এই শিল্পীরা। বহুসংখ্যক গায়কের উদাত্ত কোরাসে কোরাসে কোথায় উবে গেল শান্তিনিকেতন আর ব্রাহ্ম-সমাজের অচলায়তনের নীরক্ত রবীন্দ্রনাথ, মিছিলে-মিটিঙে-গঞ্জে-ময়দানে জন্ম নিল লড়াইয়ের, বিদ্রোহের, ভাঙনের রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রনাথের গান নতুন গীতিকারদের গানের সঙ্গে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের গানের সঙ্গে মিশে এক নতুন আয়তন পেয়ে গেল।

"সিলেট থেকে গান আর সুরের ঝাঁপি নিয়ে এলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বাঙলার গণসঙ্গীত আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁর অবদানও অবিস্মরণীয়। শচীন দেববর্মন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখ

প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ এসে সংঘের কেন্দ্র ৪৬ নং ধর্মতলার শতরঞ্চিতে বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুজাতা ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার, সাধনা রায়চৌধুরী, ভূপতি ও সুবংপতি নন্দী, দিলীপ রায় প্রমুখের পাশে বসলেন। আর শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও মহম্মদ আলি পার্কে এসে পৌঁছলেন নানা আঞ্চলিক স্কোয়াড এবং টগর অধিকারী, রমেশ শীল ও শেখ গোমানি প্রমুখ।

"বাঙলা গানের ঐতিহ্য, নতুন রচিত গান ও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত বাংলাদেশের আন্দোলনের গানের এই তিনটি হচ্ছে প্রধান উপাদান। এই গান গাইবার ও শোনার আসরেও এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। গান কোনো স্বতন্ত্র অবসরের বিষয় নয়—গান রোজকার জীবনের অঙ্গ। গান কোনো অবসরভোগী শ্রেণীর উপভোগের বিষয় নয়—যারা খাটে, গড়ে, বানায় তাদের শ্রমের স্ফূর্তি, তাদের লড়াইয়ের আবেগ ও হাতিয়ার।"

বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গণনাট্যের সঙ্গীত-গোষ্ঠী জনযুদ্ধের যুগে এইভাবেই গানকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করতে পেরেছিলেন এ-প্রসঙ্গে প্রবীন কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"চল্লিশের দশকে লোক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে কমরেড বিনয় রায়ের অবদান অবস্মরণীয়। তাঁর সহজ সুরে গাওয়া অতি সাধারণ কথার গানগুলিও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠিত। আর পার্টি ও গণ-সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের নাচগানের আসরে তিনি বেশ নামাতেও পারতেন। এই সময় নানা আন্দোলন উপলক্ষে আমি বেশ কয়েকটা ছড়া গান লিখে তাঁকে দিয়েছিলাম ('দেশরক্ষার ডাক' নামে ১৯৪৩ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী তা প্রকাশ করে। দাম : দশ পয়সা। ভূমিকা লিখেছিলের কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন ও বিনয় রায়। লেখক)

মহিলাদের মধ্যে এরকম নাচগানের জোয়ারের নেতৃত্বে ছিলেন রেবা রায় (রায়চৌধুরী, বিনয় রায়ের ছোট বোন) উষা দত্ত, সাধনা সেন, প্রীতি ব্যানার্জী প্রমুখ। আর বিনয় রায় ছিলেন সবারই শিক্ষক।"

বিনয় রায় ছাড়াও ৪৬ নম্বরের অপর সঙ্গীত-প্রতিভা ছিলেন 'নবজীবনের গান' (এগুলিও জনপ্রিয়তম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গীতিমালা, যদিও তা সংকলন রূপে প্রকাশিত হয় ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে)-এর স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। প্রাক-জনযুদ্ধ যুগে তাঁর সঙ্গীত সাধনা ছিল ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৯৪২ সালে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো বিনয় রায়ের। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীতের ধারাটাই এরপর গেল আমূল বদলে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখেছেন :

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে গান মনে আসত। এক-একদিন দুটো-তিনটে গানও আসত। যার বাড়ি হোক গিয়ে শোনাতাম, হারমোনিয়ম বাজিয়ে ঠিকমত তুলে নিতাম। আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ ছেদ পড়ত। প্রকৃতপক্ষে, গোটা তেরশো পঞ্চাশ সাল জুড়েই 'নবজীবনের গান' সৃষ্টির পালা চলেছিল।.....বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা জন 'নবজীবনের গান' গেয়েছেন। আমরা তো ছিলামই—হেমাঙ্গ, জর্জ, সুচিত্রা, হেমন্ত প্রমুখও নানা সময়ে এ গান গেয়েছেন 'নবজীবনের গান' গ্রন্থে প্রকাশকের ভূমিকায় বলা হয়েছিল : "এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত (জ্ঞানপ্রকাশ) ঘোষকে অশেষ ধন্যবাদ গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে জানাই। তাঁর মত গুণীব্যক্তি যেরকম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে একাজ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করেছেন তাতে আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর অপরিণীম স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখার্জী ও দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।"

পঞ্চাশের মর্মান্তিক মন্বন্তর মোকাবিলায় গণনাট্য সংঘ :—

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে গণনাট্য সংঘের ভূমিকা যখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তখন ১৯৪৩ সালে বাঙলায় দেখা দিল মহা মন্বন্তর। মনুষ্য সৃষ্ট এই মন্বন্তর ছিল যুদ্ধেরই অনিবার্য পরিণতি। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সকল গণসংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রাম আর মন্বন্তর-প্রতিরোধের লড়াই তখন সত্যিই সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম পার্টিগতভাবে কিছুটা সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে গঠন করলেন একটি প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ইউনিট এই ইউনিটে ছিলেন বিনয় রায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান, অনিল কাঞ্জিলাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালে পার্টির সাংস্কৃতিক সেলে ষোল-সতের জন সদস্য ছিলেন। পূর্বোক্তরা ছাড়াও ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, রবীন্দ্র মজুমদার, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মনি রায়, অনিল সিংহ প্রমুখ।

মন্বন্তর-এর বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, ক্ষুধার্ত বাঙলাকে বাঁচাবার জন্য সেদিন অন্যান্য গণসংগঠনগুলির মতো সাংস্কৃতিক সেলের কর্মীরাও যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'নবজীবনের গান'-এর মতো সঙ্গীত 'নবান্ন'র মতো নাটক, 'ভুখা হ্যায় বঙ্গাল' বা 'Spirit of India'র মতো ব্যালে নৃত্যের অবিস্মরণীয় উৎস ছিল এই মন্বন্তরের যন্ত্রণা।

১৯৪৩-৪৪ সালে মন্বন্তর-বিরোধী কর্মোদ্যোগ ও ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলন এবং সংগ্রাম গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মীরা একযোগেই পরিচালনা করতে শুরু করেন। একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ, অন্যদিকে মন্বন্তর সৃষ্টিকারী জোতদার-জমিদার ও ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশুভ আতাঁতের মুখোশ উন্মোচন, এবং উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মীরা গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্পানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

যাহোক, বাঙলা থেকে একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ড প্রথম বম্বে পৌঁছায় ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে। 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' নামেই তা বম্বেতে সংবাদ মাধ্যমগুলির কল্যাণে সব থেকে বেশি মাত্রায় পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বাঙলা থেকে এই সাংস্কৃতিক টিমকে বোম্বে প্রেরণ করার পশ্চাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর 'উদ্যোগ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা' কে. জ্যোতিরিন্দ্রমৈত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে, যদিও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর আনুষ্ঠানিক নেতা ছিলেন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় রায়।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, যে সাংস্কৃতিক টিম অনুষ্ঠান করে বাঙলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বম্বে গেল তাতে একমাত্র শম্ভু মিত্র ছাড়া সম্ভবত আর কোনো পেশাদারী শিল্পীই ছিলেন না। তৃপ্তি মিত্র (তখন ভাদুড়ি) সেই সময় নয় টিমে এসেছেন। কেবলমাত্র রাজশাহী থেকে প্রীতি সরকার (পরে ব্যানার্জী)-কে আনা হয়েছিল তাঁর অসম্ভব মিষ্টি কণ্ঠস্বরের কথা শুনে। এছাড়া উত্তর ভারত সফরের জন্য অবাঙলা ভাষী কয়েকজনকেও টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢোলবাদক ট্রাম শ্রমিক দশরথ লাল, প্রেম ধাওয়ান, নেমী চাঁদ ও রেখা জৈন প্রমুখ।

বোম্বেতে ও পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' যে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিনয় রায়-এর

একাঙ্ক হিন্দী নাটিকা 'ম্যাঁয়ভুখা হুঁ' পান্থ পাল-এর 'মহামারী নৃত্য' এবং 'ভারতের মর্মবাণী' বা স্পিরিট অফ ইণ্ডিয়া' নামক সঙ্গীতনৃত্য—আলেখ্য (ব্যালে) প্রভৃতি। এছাড়া ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও দুর্ভিক্ষ-বিরোধী সম্মেলক সঙ্গীত।

বাঙলার দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ভয়াবহতা সম্পর্কে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণ প্রায় অনবহিতই ছিলেন। তাই 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' এর অনুষ্ঠান বোম্বে ও পঞ্জাবসহ উত্তরভারতে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়। তাছাড়া নাটক-গান-নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যমের এক নতুন ধরণের গণভিত্তিক আঙ্গিকের সঙ্গেও উত্তর ভারতের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ পরিচিত হন। বিষয়-বৈচিত্র্যে, আঙ্গিক নৈপুণ্যে, গণ আবেদন সৃষ্টিতে ও আন্তরিকতায় 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠানগুলি এক নতুন সৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বাঙলার এই সাংস্কৃতিক টিমের উত্তর ভারত পরিক্রমাকে যাঁরা কমিউনিস্ট প্রচার কৌশল মনে করতেন তাঁরাও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'এর অনুষ্ঠানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ২১শে এপ্রিস বোম্বে শহরে বাঙলার শিল্পীরা সর্বপ্রথম একটি 'প্রেস শো' করেন। ১লা মে, মে দিবস উপলক্ষে পূণাঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শ্রমিক মহল্লাগুলিতে গিয়ে 'বাঙলা ট্রুপ' ছয়টি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এবং তা বিপুল সাড়া জাগায়। বোম্বের কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পার্টির অপপ্রচার ও অসহযোগিতা সত্ত্বেও (কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট নেতা মিনু মাসানী তখন বোম্বে শহরের মেয়র) প্রায় ৭৫ হাজার বোম্বেবাসী 'ভয়েস অফ বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠান রেখে অনুপ্রাণিত হন। বোম্বের অনুষ্ঠান থেকে বাঙলার অজ্ঞাত ও অখ্যাত শিল্পীগোষ্ঠী প্রায় ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে ৭ হাজার টাকা অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রী করে বাকিটা দান হিসেবে সংগৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন: পৃথ্বীরাজ কাপুর, ভি. শান্তারাম, মারাঠি নাটকার, মামা ওয়ারেরকার, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল—প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র তারকা কে এল. সায়গল কমিউনিস্ট পার্টির পাঁচ লাখ টাকার তহবিলে সাহায্য সংগ্রহের জন্য 'ভিক্ষাঝুলি' নিয়ে পথে নামেন। কারণ, তাঁর মতে 'কমিউনিস্ট পার্টির মানবহিতৈষী কাজ' তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

'ভয়েস অব বেঙ্গল'-এর অনুষ্ঠান বোম্বের সংবাদপত্র মহলে উদ্ভাসিত প্রশংসা অর্জন করে। 'বম্বে ক্রনিকল,' 'বম্বে সেন্টিনেল' 'দি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'

প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্র বাঙলার শিল্পীগোষ্ঠীর ব্যালে ও সঙ্গীতকে ভারতীয় সাংস্কৃতির এক দিক নির্দেশক ধারা বলে যেমন চিহ্নিত করে তেমনি একে একটি বাস্তব ও শিক্ষামূলক শিল্প-প্রচেষ্টা রূপেও বর্ণনা করে। বলা হয়, এই নতুন ধরণের সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি জাতীয় আন্দোলন এবং জন-সাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন এই আন্দোলনের পেছনে থাকা উচিত। এমনকি যে-গুজরাটি সংবাদপত্রগোষ্ঠী কমিউনিস্টদের সঙ্গে থাকা যে-কোনো কাজকেই বয়কট করে এসেছে এতদিন ধরে, তারাও পর্যন্ত তাদের পত্রিকায় লিখেছিল :

"বাঙলা থেকে আগত যুবগোষ্ঠী প্রকৃত শিল্পের রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই শিল্পীগোষ্ঠী হল এমন কর্মী মানুষ যাঁরা মানুষের মঙ্গলার্থে জীবনের সবকিছুই পরিত্যাগ করেছেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র শম্ভু মিত্র-রই মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে কিন্তু যখন আমরা বিনয় রায়, উষা দত্ত ও রেবা রায়কে মঞ্চে দেখি তখনই উপলব্ধি করতে পারি যে, শিল্পের সঙ্গে জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।...এঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এঁরা হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।...এঁদের পরিবেশিত সঙ্গীত শুধুমাত্র কণ্ঠনিসৃত ধ্বনি মাত্র নয়, এর উৎস হল এক অনুপ্রেরণার আগুন।"

এই সব কথাই লেখা হয়েছিল সেদিন 'জন্মভূমি,' 'নূতন গুজরাট' ও 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি সংবাদপত্রে।

এরপর বোম্বেতে মে মাসে (১৯৪৪) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় ট্রুপ। পি. সি. যোশীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়, বোম্বের 'রেড ফ্লাগ হল—এ শুরু হল গনণাট্যসংঘের সংস্কৃতি-কর্মীদের একত্রিত 'কমিউন জীবন'। গণসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সূচিত হলো নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

শুধুমাত্র বোম্বাই নয়। এর পূর্বেই বাংলা থেকে একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়ার্ড বিনয় রায়, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি নন্দী, দশরথ লাল, সাধনা সেন (গুহ), নরেন ভট্টাচার্য্য উষা সিং (দত্ত) প্রমুখের নেতৃত্বে পঞ্জাব পরিভ্রমণ করেন। ১৭ নভেম্বর (১৯৪৩) থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৩ পর্যন্ত পঞ্জাবের ১০টি জেলা এবং দুটি দেশীয় রাজ্য দিল্লী এবং আগ্রা এই সাংস্কৃতিক দল সফর করেছিল। প্রায় ১ লক্ষ ৭৫০ জন দর্শক এঁদের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন। নগদ অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল ৩২ হাজার ৪৭২ টাকা। এছাড়া গ্রামের মানুষও খাদ্যশস্য এবং অলঙ্কারাদি বাঙলার এই সাংস্কৃতিক ট্রুপের হাতে

তুলে দেন। সমগ্র উত্তর ভারত থেকে 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' সর্বমোট সংগ্রহ করে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, যা তখনকার বিচারে ছিল এক অকল্পনীয় ঘটনা। এই পর্যায়ে সবথেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দুটি ছিল : উষা দত্ত-র 'ভুখা নৃত্য' এবং শান্তি বর্ধনের 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' বা 'ভারতের মর্মবাণী' এবং ইমমরটাল ইণ্ডিয়া বা অমর ভারত' নামক ব্যালে। 'নবজীবনের' গান'-এর খানিকটা এবং গম্ভীরা ধরণের 'গাজন' গানও ছিল এই ব্যালের অন্তর্ভুক্ত। গাজনের শিব সাজতেন শচীনশঙ্কর আর পার্বতী সাজতেন রেখা জৈন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলমোড়া সেন্টার (উদয়শঙ্করের ওয়ার্কশপ) ভেঙে যেতেই প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর বোম্বে চলে আসেন। অবশ্য এর পূর্বে ২৪ ডিসেম্বর (১৯৪৩) বিনয় রায় তাঁর সাংস্কৃতিক ট্রুপ নিয়ে দিল্লিতে উদয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি এই ট্রুপের অনুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা করেন। উদয়শঙ্কর বোম্বে আসার পর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ৩০শে জানুয়ারি উদয়শঙ্কর বাঙলার দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্যের জন্য একটি অনুষ্ঠানসহ (যার উদ্বোধন করেন বোম্বের কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই) মোট দুটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এরজন্য উদয়শঙ্করকে অনেক অপপ্রচারের সম্মুখীন হতে হলেও তিনি এই সময় গণনাট্য আন্দোলনের পাশেই ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের ট্রুপে কয়েকজন শিল্পীকেও 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' এবং 'গণনাট্য সংঘে'র সদস্য করে দিয়েছিলেন। এ দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শচীনশঙ্কর, রবিশঙ্কর অবনী দাশগুপ্ত (ব্যালে পরিচালক) শান্তি বর্ধন প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীরা। এর মধ্য দিয়ে সেই সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের ব্যাপক গণভিত্তি ও অতুলনীয় জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে (প্রধানত যোশীর উৎসাহে) বোম্বের আন্ধেরীতে, সেই সময় শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের যে 'কমিউন' ও 'ওয়ার্কশপ' ছিল তাতেও সামিল হন রবিশঙ্কর ও শান্তি বর্ধন।

জনযুদ্ধের যুগে গণনাট্য সংঘের নাট্য আন্দোলন :

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙলা ভাষায় এই সংঘের লেখকেরা যে সমস্ত নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি-

ফলিত হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রধানত শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। বাঙলা ভাষায় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে, বিশেষ করে কাব্য-প্রবন্ধ ও গল্পে এবং কিছু কিছু উপন্যাসে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের অনেক আগেই লক্ষ্য করা গেছে। সংঘ গঠনের সূচনাপূর্বে শ্রমিক-মালিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত লেখেন 'ভাঙা চাকা' নাটক (মে, ১৯৩৬)। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে তিনি পরপর অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ভাঙা চাকা' ও 'চালের দর' (১৯৪৩)। সম্ভবত জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তই আমাদের দেশে মার্কসবাদী শ্রেণী-দৃষ্টিতে প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালের হুগলীর দয়ালকুমার রচনা করেন 'মুক্তির অভিযান' ও 'আলোর পথে' নামক সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী দুটি নাটক। হুগলী ও বর্ধমান জেলার বহুস্থানে উক্ত নাটক দুটি অভিনীত হয়।

তবে সংগঠিতভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক পরিবেশনের কৃতিত্ব 'গণনাট্য সংঘে'র পূর্বে অবশ্যই দাবি করতে পারে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট'। ১৯৪০-৪১ সালে সুনীল চট্টোপাধ্যায়, জলি কল ও দেবব্রত বসুর লেখা নাটকের অভিনয়ই গণনাট্য সংঘের নাট্য পরিবেশনার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করতে সাহায্য করেছিল।

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের প্রচারমাধ্যম রূপে নাটককে ব্যবহার করার জন্য 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় (১৬ই মে, ১৯৪২) নতুন নাটক চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে অনেক নাটকই জমা পড়ে। তার মধ্যে বনস্পতি গুপ্ত রচিত 'দেশ রক্ষার ডাক' নাটকটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এই বনস্পতি গুপ্ত-র প্রকৃত পরিচয় দীর্ঘকালই অজ্ঞাত ছিল। প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষক ধনঞ্জয় দাশ আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ নামটি প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীরই ছদ্মনাম।

যাহোক, এই সময় থেকে নতুন নতুন নাট্যকারের আগমন যেমন ঘটতে লাগল তেমনি তাঁদের রচিত নাটক গ্রাম এবং শহরেও অভিনীত হতে থাকল। ১৯৪২-৪৪ সালে অভিনীত যে সব নাটকের সংবাদ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হল: ১) দেশরক্ষার ডাক (বনস্পতি গুপ্ত); ২) পতঙ্গের প্রতিশোধ (ঐ); ৩) কর্ণফুলির ডাক (সুবোধ ঘোষ); ৪) অভিযান

(দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই নাটকেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ দীপশিখা; ৫) এক-রাত্রি (প্রভাতকুমার গোস্বামী); ৬) চালের দর (জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত); ৭) জাপানকে রুখতে হবে; ৮) রাজবন্দীদের মুক্তি চাই; ৯) প্রতিরোধ; ১০) এক হও এই সব নাটকের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নি)।

১৯৪৩-৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে যখন বাঙলা জুড়ে এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্তমানুষের সেবার জন্য সাহায্য সংগ্রহের আশায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে তখন তিনটি নাটক দর্শক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই তিনটি নাটক হলো: প্রখ্যাত নটও নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (যিনি তৎকালীন গণনাট্য সংঘে-র বাঙলা শাখার সভাপতি ছিলেন এবং 'মহর্ষি' অভিধায় সমাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন) 'হোমিওপ্যাথী' এবং বিজন ভট্টাচার্য-রচিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক। 'জবানবন্দ' হিন্দী ভাষায় 'অন্তিম অভিলাষ' নামে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 'নবান্ন' নাটক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক ভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে এক দিকানির্দেশক ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের শেষপর্বে এই নাটক একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় দুর্নীতির (জোতদার জমিদার ও ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর কালোবাজারী) বিরুদ্ধে ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদের হাতিয়ার।

ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে বাংলার লোকসংস্কৃতি:

বাঙলায় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিল Y. C. I এর যুবগোষ্ঠি। তবে তাঁদের সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে নগর কেন্দ্রিক। বাঙলার সমৃদ্ধ লোকগীতি, লোকনৃত্য, যাত্রা, পাঁচালী, তরজা বা কবির লড়াই-এর মতো লোক-সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি তাতে ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, জনযুদ্ধের যুগে, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর, বিশেষ করে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘের নাট্যশাখারূপে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার (১৯৪৩) পরেই বাংলার অব-হেলিত লোক সংস্কৃতিকেও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা হয়। বিনয় রায়-ই সর্বপ্রথম বাঙলার আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে তার গায়কী ও সুর-কাঠামো অবলম্বনে নতুন গণসঙ্গীত রচনা

এবং পরিবেশনা শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল—গানের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে প্রবেশ করা।

এরই প্রতিফলন দেখা গেল 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র দ্বিতীয় তৃতীয় সম্মেলনে (১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সাল)। ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলন ও জনযুদ্ধের নীতি যদি গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হয়, তবে লোক সংস্কৃতিকেই করতে হবে এর অন্যতম প্রধান বাহন একথা উপলব্ধি করেই 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সম্মেলনে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পরিবেশন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন চলে। ১৫ই—১৬ই জানুয়ারি (১৯৪৪) সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন সম্পর্কে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'বাংলার গণশিল্পীদের সমাবেশ' এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সংস্কৃতি উৎসব' শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয়: "সম্মেলন উপলক্ষে এবার রংপুর, জলপাইগুড়ি, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া ২৪ পরগণা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দলগুলি বিভিন্ন জেলার লেখক, সুগায়ক, ও বিশিষ্ট শিল্পীদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ হইতে কবি নিবারণ পণ্ডিত, শ্রীহট্ট হইতে গীতিকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গায়ক নির্মল চৌধুরী, রংপুর হইতে নৃত্যশিল্পী পান্থ ও কীর্তনীয়া নগেন সা, মালদহ হইতে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে গম্ভীরা দল, খুলনা হইতে হিমাংশু চক্রবর্তী, যশোহর হইতে কবিগায়ক নেপাল সরকার, হুগলী হইতে কবি দয়ালকুমার প্রভৃতি আরও অনেক প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পী এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আসেন।"

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৬ই জানুয়ারি সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে ৬ হাজার দর্শকের সামনে বাঙলার লোকসংস্কৃতির লুপ্তধারাটি আবার সজীব হয়ে ওঠে। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় লেখা হয়:

"কলিকাতায় এমন উৎসব আর হয় নাই। বিভিন্ন জেলা হইতে বিশিষ্ট শিল্পীর দল আসিয়াছেন। তাঁহারা কেহই সৌখিন গায়ক ও শিল্পী নন। শিল্প-পদ্ধতি তাঁহাদের হাতে দেশপ্রেমের অস্ত্র হইয়া দেখা দিয়েছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে ইহাদের যোগ প্রত্যক্ষ। তাই ইহাদের শিল্প কৌশল ব্যর্থ হয় নাই।.....এঁরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বলিয়াই ইহাদের শিল্প প্রকাশ এত সার্থক। দেশের সংস্কৃতি আজ ইহাদের আন্দোলনে নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে।"

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সূচনাপূর্বের মূলশক্তি এখানেই ছিল নিহিত। এরই পরম্পরা আজও বাঙলার সংস্কৃতি-জগতে অর্ধশতাব্দীকাল নিত্য প্রবাহমান।

সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও ধনতন্ত্রের সংকট

সুজিত পোদ্দার

রাষ্ট্র কাঠামো পরিচালনায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের শাসন ব্যবস্থার প্রচলন দেখা গেছে। প্রাগঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বিভিন্ন ধরণের শাসন ব্যবস্থায় সর্বত্রই সাধারণভাবে, শাসকগোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শাসককুল নিজেদের ভোগ বিলাস ও বৈভব বজায় রাখার জন্য এক দিকে চালিয়েছে মানুষের উপর শোষণ অন্যদিকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহকে দমন করার জন্য চালিয়েছে অত্যাচার ও নিপীড়ন। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সামরিক একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শাসন ব্যবস্থা দেখাগেছে পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়। কোন শাসন ব্যবস্থাই শুধু অত্যাচার এবং শোষন চালিয়ে বেশীদিন ক্ষমতা কায়েম রাখতে পারেনি। অন্যদিকে বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা এবং এর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে কিছুকিছু রাষ্ট্রের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস কয়েক'শ বছরের পুরানো। তবে শুধু অত্যাচার আর শোষণ চালিয়ে কয়েকশ বছর ধরে কোন শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখা সম্ভব হয়নি। যেখানে স্বার্থের সংঘাত হয়েছে শাসকগোষ্ঠীকে মানুষের ইচ্ছাকে মর্য্যাদা দিতে হয়েছে। কালের গতির সংগে তাল মিলিয়ে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে চেতনার উন্মেষকে মর্য্যাদা দিয়ে শাসকবর্গকে বিভিন্ন পরিবর্তন আনতে হয়েছে শাসন পরিচালন ব্যবস্থায়। আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষের অধিকারকে স্বীকার দিতে হয়েছে শাসন ব্যবস্থায়। অন্যথায় অত্যাচারী শাসকবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে—প্রচলন হয়েছে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

পুরনো যাযাবরদের রাজত্বে প্রধান সমস্যা ছিল রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের। এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করতো। রাজতন্ত্র তুলনামূলকভাবে স্থায়ী সরকারের পথ দেখায়। একদিকে আধুনিক শিক্ষার আলোকে মানুষের চেতনায় বিকাশ অপর দিকে ভোগবিলাসী অলস কর্মবিমুখ রাজাদের রাজত্বে প্রজাদের সঙ্গে রাজশক্তির সংঘাত সৃষ্টি হয়। মানুষের চাহিদা

পূরণের জন্য উন্নয়নের আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অনেক দেশে রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করে কার্যকরী শাসন ক্ষমতা গণতান্ত্রিক শক্তির হাতে তুলে দিয়েছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেখানে রাজতন্ত্র কায়েম রয়েছে। আধুনিককালে, নেপালে দেখাগেছে দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে গণতান্ত্রিক শক্তির হাতে রাজা সত্যিকারের শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। রাজাই থেকেই গেছেন রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। রাজার এই নতি স্বীকার সম্পূর্ণ বাঁচার তাগিদে। অন্যথায় রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা দখল করতো। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কোন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রের ব্যাপক মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে শুধু অত্যাচারের বাঁধুনিকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পৃথিবীর এক-প্রান্তের মানুষকে অপরপ্রান্তের মানুষের কাছে এনে দিয়েছে। মানুষের চাহিদা বেড়েছে। চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মানুষ আর মুখবুজে অত্যাচার সহ্য করতে রাজী নয়। জার্মানি, ইটালি ও জাপানে ফ্যাসীবাদ বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। দক্ষিণ অফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের অবসান হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। গ্রেট ব্রিটেন রাজতন্ত্র টিকে আছে রাজশক্তির জোরে নয়। গণ-তান্ত্রিক শক্তির ইচ্ছায়। ঐ দেশের মানুষ যতদিন চাইবে ততদিন ওখানে রাজতন্ত্র টিকে থাকবে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই কি মানুষের সকল আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পেরেছে? মানুষে মানুষে যে বৈষম্য, মানুষের বঞ্চনা, হিংসা, অত্যাচার, জুলুম কি লোপ পাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়? না গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আহার বাসস্থানের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারেনি। পশ্চিমের উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশের কিছু পার্থক্য আছে। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর ঔপনিবেশিক শোষনের মাঝদিয়ে। ঔপনিবেশিক শোষনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে-ছিল বহুজাতিক সংস্থার বাজার দখলের প্রতিযোগিতা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগতকরে উপনিবেশ তৈরী করে ওখানকার কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজের দেশে নিয়ে পণ্যসামগ্রী তৈরী করে পুনরায় বিভিন্ন দেশের

বাজারে বিক্রি করছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশে বেকার সমস্যা বেড়েছে, দেশে সম্পদ তৈরী হয়েছে। দেশের এবং মানুষের চাকচিক্য বেড়েছে অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শোষনের ফলে পরাধীন দেশগুলির মানুষের অবস্থার অবনতি হয়েছে। আজ রাজনৈতিক উপনিবেশ আর নেই কিন্তু উন্নত দেশগুলো ওদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য একদিকে রপ্তানী করছে বহুজাতিক সংস্থা অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে বহুজাতিক আর্থিক সংস্থার। এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উন্নত দেশগুলি কোনক্রমে ওদের ঠাট্‌বাট্‌ বজায় রাখতে পারলেও উন্নয়নশীল দেশ-গুলো আরও বেশী সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার এবং প্রতিবাদ করার অধিকার। কিন্তু আজ উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশগুলো অর্থনৈতিক সংকটে পাকখেয়ে ক্রমে হিংসাত্মক পরিস্থিতির মুখো-মুখি হচ্ছে। এই হিংসার প্রধান বলি হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। হিংসায় আক্রান্ত ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, সিংহল আরও অনেক দেশ। এই হিংসার মূল কারণ আর্থিক সংকট। সম্পদের উপর মুষ্টিমেয়র একাধিপত্য মেনে নিতে পারছেনা বঞ্চিত মানুষেরা। তেমনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হচ্ছে সম্পদের বিকাশ ঘটাতে। ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে। সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে হিংসার পথ বেছে নিচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান করলেও ব্যর্থ হয়েছে অনেক প্রত্যাশা পূরণ করতে। সমাজে প্রতিটি মানুষের স্বস্থভাবে বাঁচার অধিকার সুরক্ষিত করতে পারেনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। ফলে মানুষ এমন একটি সমাজব্যবস্থার কথা ভাবতে থাকে যেখানে ঐশ্বর্যের বৈভবের পাশাপাশি দারিদ্র্যের হাহাকার বিরাজ করবেনা। আর্থিক বৈষম্যকে ঘুচিয়ে শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার এক নতুন অর্থনীতির তত্ত্ব, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এবং সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করেন কার্ল মার্কস। এই গোটা পরিকল্পনাই মার্কসবাদ। মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে। মার্কস এবং এঙ্গেলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রবর্তন করেন এটি অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই আদর্শকে ভিত্তিকরে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের পরি-কল্পনা গ্রহণ করেন লেনিন। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রুশ সাম্রাজ্যের অবসান

ঘটিয়ে রুশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে সূচনা করা হয় রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। প্রায় ৪ বছর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেরপর পূর্বতন রুশ সাম্রাজ্যের উপর বিপ্লবী শক্তির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সূচনা হয় সোভিয়েত রাশিয়ার।

নতুন সোভিয়েত সরকারের যাত্রাপথ কখনই কণ্টকহীন ছিলনা। রুশ সাম্রাজ্য ছিল বহুজাতিতে বিভক্ত। প্রতেকটি জাতি অর্থাৎ, ইউক্রেন, জাজিয়া লিথোয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং অন্যান্যরা প্রত্যেকে জাপান, জার্মানী, পোলাণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। এই লড়াই ছিল এক দিকে স্থানীয় বুর্জোয়ার বাঁচার লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাজার রক্ষার লড়াই অপরদিকে নতুন সোভিয়েত সরকারের শোষণহীন সমাজ কায়েম করার লড়াই।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উৎপাদনে ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি ঘটানো, বন্টন ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং বাসস্থান ছাড়া সবরকমের সম্পত্তিতে রাষ্ট্রের মালিকানা কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় একমাত্র সরকারই সবকিছুর মালিক এবং দেশের প্রতিটি মানুষই সরকারী কর্মচারী। যিনি সরকারী অফিসে কাজ করেন তিনি যেমন সরকারী কর্মচারী তেমনি যারা কারখানায় কাজ করেন, ক্ষেতে খামারে কাজ করেন, দোকানে কাজ করেন, হাসপাতালে, বিদ্যালয়ে বা বিজ্ঞান প্রযুক্তির গবেষণায় নিযুক্ত তারা সকলেই সরকারী কর্মচারী।

সোভিয়েত সরকারকে একটি প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করতে হয়েছে। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত হতেন বংশ পরম্পরায়। রাষ্ট্র কাঠামো ছাড়া, কলকারখানা, ক্ষেত খামার শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য সরবরাহ যোগাযোগ সবই ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন। এই ব্যক্তি মালিকানার বাধা অতিক্রম করে প্রতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশের আক্রমণ প্রতিহত করে সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা সম্ভব হয়েছিল।

শুধু পুরাতন ব্যবস্থার উৎপাটন নয় নতুন ব্যবস্থা চালু করা এবং একে গতিশীল করে তোলা ছিল সোভিয়েত সরকার এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কাজ। এই কাজে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার লেনিন, সোভিয়েত সরকার এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টিকে সহায়তা করা বা পরামর্শ দেওয়ার কেউ ছিলনা। অনুকরণ করার বা অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে

শিক্ষা নেওয়ার কোন সুযোগ ছিলনা। কারণ এক অভিনব তত্ত্ব এবং এর প্রথম প্রয়োগ সোভিয়েত সরকার। এই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। প্রতিটি মানুষের চাকুরীর নিরাপত্তা দেওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেককে চাকরীর সুযোগ দেওয়া, সকলের জন্য বাসস্থান, প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে উন্মুক্ত করা, স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সরকারের হাতে রেখে প্রত্যেককে সমান সুযোগ দেওয়া ছিল এই সরকারের প্রধান কর্মসূচী।

এক দিকে ধ্বংস অপর দিকে সৃষ্টি। ধ্বংস করতে হবে ব্যক্তি মালিকানা সমাজের সকল স্তর থেকে নির্মূল করতে হবে মুনাফার সুযোগ। একটি শিল্পে পিছিয়ে পড়া দেশ। রাশিয়া, ইউক্রেনের কিছু অঞ্চল বাদ দিলে রুশদেশের সর্বত্র জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। আর কৃষি ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি মালিকানার হাতে। বাজারে-সবজী বাজার কাচামালের বাজার, শিল্পদ্রব্যের বাজার সবইত ব্যক্তি মালিকের হাতে। ছোট বড় শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা সবই বেসরকারী হাতে। এক কথায় বলতে গেলে মানুষের আয়ের প্রধান উৎসগুলোই ছিল বেসরকারী হাতে। ক্ষমতা দখল করে সোভিয়েত সরকারকে বহু লক্ষ কোটি মানুষের হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ারি কেড়ে নিতে হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করতে হয়েছে ব্যক্তিগত পুঁজি। বলা বাহুল্য এতগুলো মানুষ স্বেচ্ছায় হাসিমুখে ক্ষমতা ছেড়ে দেননি। অবশ্যই সরকারকে বল প্রয়োগ করতে হয়েছে। আবার যারা ক্ষমতা ত্যাগ করেছে তারাও চুপচাপ বসে থাকেনি চক্রান্ত করেছে কি করে হাতে ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যায়। সরকারকে সেদিকেও নজর রাখতে হয়েছে। প্রয়োজনে কঠোর হতে হয়েছে।

শুধু পুরনো ব্যবস্থার অবলুপ্তি নয় সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ চলেছে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা সচল করা। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করে তৈরী করতে হবে নতুন সমন্বয়। কৃষক আর ফসল উৎপাদন করে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসবে না। সরকারই এই ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করবে। এই ব্যবসায় কৃষকের লাভ, প্রকৃতির দয়ার উপর চাষীর জীবন নির্ভরশীল নয়। চাষীর ফসল যাইহোক ওর আয় সুনিশ্চিত। চিকিৎসার ভার সরকারের। তাদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব সরকারের। চাষের ফসল বা কারখানায় তৈরী সামগ্রী সবই বিপনণের দায়িত্ব সরকারের। কারখানায় উৎপাদনের

জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল যোগানের দায়িত্বও সরকারের। শুধু উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করলেই চলবেনা উৎপাদনের হারও বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাড়তি উৎপাদনের জন্য বাড়তি মজুরী নয়। মজুরী পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে এবং উৎপাদন সমাজের প্রয়োজন অনুসারে। নতুন সোভিয়েত সরকারের কোন বন্ধু রাষ্ট্র নেই। সকলেই শত্রু। চক্রান্ত করছে কি করে এই শ্রমিকশ্রেণীর সরকারকে উৎখাত করা যায়। প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে না পারতে দেশের মানুষ অভুক্ত থাকবে। প্রয়োজনীয় কয়লা লোহা সরবরাহ করতে না পারলে বিদ্যুৎ তৈরী হবে না, ইস্পাত তৈরী হবে না, দেশের পরিকাঠামো বানানো যাবে না। এক দিকে উৎপাদন শক্তিকে শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে মুক্ত করা অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল শুধু বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। গোটা জাতিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। শোষণহীন সমাজের চেতনা। বহুজাতির সমন্বয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন রুশজাতির জন্ম নিয়েছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের শুধু ভিন্ন জাতীয় সত্তা ছিল তাই নয় জীবনযাত্রার মানও ছিল দুস্তর ফারাক। পশ্চিমাংশের ইউরোপের প্রজাতন্ত্রগুলি অর্থনীতি শিক্ষা সংস্কৃতিতে খুবই অগ্রসর ছিল। মধ্য রাশিয়া এশিয়া ভূ-খণ্ডের বিস্তৃত অঞ্চল ছিল খুবই পশ্চাদপদ। সোভিয়েত সরকার বিদেশী শক্তির মোকাবিলার মাঝ দিয়ে সমগ্র রুশজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। দ্রুত অগ্রগতি হয়েছিল পশ্চাদপদ অংশের। বিপ্লবের ১০ বছরের মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রায় অগ্রগতি শুরু হয় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় শিক্ষা এবং বাসস্থানের। একটি শক্তিশালী সরকার আপামোর জনসাধারণের সমর্থনকে পাথেয় করে ১৯২৮ সালে শুরু করে উন্নয়নের পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় কৃষির অগ্রগতির, শিল্পের অগ্রগতির। সামাজিক পরিকাঠামোর অগ্রগতি সমাজকল্যাণমূলক কাজের অগ্রগতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েত অর্থনীতির যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কিন্তু তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অল্পদিনের মধ্যেই জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের ব্যয়ভার পরিকল্পিত অর্থনীতির উপর কঠোর আঘাত আনে। মানুষের জীবন যাত্রার মানও ব্যাহত হয়। জাতীয় আয়ের প্রায়

৪০/৪৫ ভাগ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করতে হতো। উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা বজায় রাখার জন্য সরকারকে হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে কঠোর এবং নির্মম। ফ্যাসিবাদের আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায় দুই কোটি মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। যুদ্ধ থামলেও সোভিয়েত জনজীবন, অর্থনীতির যুদ্ধের প্রভাব থেকেই যায়। যুদ্ধের ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হলেও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের বিরোধ থেকেই যায়। ফলে প্রতিরক্ষার জন্য সরকারের ব্যয়বরাদ্দ খুব কমানো সম্ভব হয়ননি। সরকারী নির্দেশ জারি করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হতো। অনেক ক্ষেত্রেই কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভীতির সম্পর্কে পরিণত হয় কাজ করতে হয়ে, সময় মত কাজ করতে হবে নাহলে সাজা পেতে হবে। এই ভাবেই সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থা চলে স্তালিনের জীবদ্দশা পর্যন্ত।

স্তালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনস্ট পার্টির ২০তম পার্টি কংগ্রেসে সরকার এই পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করা হয়। সোভিয়েত সরকার শুধু শ্রমিক শ্রেণীর সরকার নয়, এই সরকার জণগনের সরকার। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করা হয়। সোভিয়েতের লৌহ প্রাচীর (আইরন কার্টেন) শিথিল করা হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কুটনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ফলে পশ্চিমের উন্নত দেশ, যে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক লেনদেন সম্পর্কের সূচনা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবন যাত্রার সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ইউরোপের উন্নত দেশের মানুষের জীবন যাত্রার তুলনা ধরতে আরম্ভ করে।

ইউরোপ বা আমেরিকার মানুষের জীবন যাত্রার মান শুধু উন্নত নয়, এক দিকে যেমন খাওয়া পরার স্বাচ্ছন্দ্য অন্যদিকে আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তবে সেই সঙ্গে আয়ের বৈষম্য, জীবনযাত্রার মানের ফারাক। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অজানা সমাজতান্ত্রিক দেশে সকলের জন্যই মানুষের জীবনের ন্যুনতম চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা সরকার করেছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর করা সম্ভব হয়নি। এর অনেকগুলো কারণ ছিল। বিপ্লবের পর থেকে একের পর এক বাধার সম্মুখীন হয় নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকার। বিপ্লবের পর নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে নিয়ে গৃহ যুদ্ধের

সম্মুখীন হয় সোভিয়েত সরকার। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা। গৃহ যুদ্ধের পর কিছু দিনের বিরতি। তখন মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে অনেকটা এগনো সম্ভব হয়। এর পরই আবার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চলতে থাকে ঠাণ্ডা লড়াই। এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোভিয়েত সরকারকে দেশের সম্পদের একটা বৃহৎ অংশ সোভিয়েত দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার না করে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে রক্ষা করার কাজে ব্যবহার করতে হয়। বিপ্লবের পর রুশ জাতীর ঐক্যের যে সূচনা হয়েছিল সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধ এবং বহিশত্রুর মোকাবিলার মাঝ দিয়ে এই ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। বিপ্লবের পর প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ যে নিয়মানুবর্তিতা যা সোভিয়েত সরকারের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নির্দেশ হাসিমুখে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, প্রজন্ম পরম্পরায় এই আত্মত্যাগের মনোভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে সরকার বা পার্টি থেকে মানুষের দূরত্ব তৈরী হতে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোগ্য পণের চাহিদা বাড়লেও সরকারের পক্ষে এই প্রত্যাশা পুরণকরা সম্ভবপর হয়নি। সরকারের কাছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষাই প্রাধান্য পায়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সরকারকে বেশীবেশী করে কেন্দ্রীকতার উপর নির্ভর করতে হয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখার জন্য। কিন্তু এরপরও কোন ক্ষেত্রই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। ক্রুশ্চভের আমলে শুধু কেন্দ্রীকতার উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরণের উৎসাহ ভাতা চালু করা হয়। কিন্তু উৎসাহ ভাতাও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছিল বাড়তি পয়সা হাতে থাকলেও বাজারে বাড়তি ভোগ্যপণ্য বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রুশ্চভ ব্রেজনেভের আপত উদারনীতি সমাজতন্ত্রের মূল সমস্যার সমাধান কিছুই করতে পারেনি। জাতীয় আয় বাড়াতে পারেনি। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে পারেনি। ফলে পার্টি এবং সরকার জনগণ থেকে আর ও বেশী বেশী বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

পার্টি এবং সরকারের মধ্যে তৈরী হয় স্তর বিভক্ত প্রশাসনিক কাঠামো। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাই হয় এই প্রশাসনের পরিচালনার মূল নীতি। নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রথম পর্যায় কেন্দ্রীকতার প্রয়োজন থাকলেও প্রত্যাশা

ছিল প্রশাসনে স্তিতাবস্থা ফিরে এলে সরকার ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারিবে। মানুষের পছন্দমত খেয়ে পরে বাঁচার পথ প্রসস্থ হবে। কিন্তু প্রথমে বিশ্বযুদ্ধ তারপর গৃহযুদ্ধ তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সবশেষে ঠাণ্ডা লড়াইএর ফলে সরকারকে মানুষের কাছ থেকে নিতে হয়েছে বেশী কিন্তু প্রতিদানে দিতে হয়েছে ন্যূনতম চাহিদার বেশী নয়। প্রথমে মানুষ ভয় করতো ভক্তিতে পরে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক দাঁড়ায় ভয়ের। কাজ করতে হবে কাজ না করলে শাস্তি পেতে হবে। সোভিয়েত সরকার পার্টির কাজে এই অবস্থা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন রাস্তা খোলা ছিলনা।

এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন মানুষের মনে সরকার পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারীতা নিয়ে যখন সংশয় তীব্র তখন গর্বাচভ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য চালু করেন গ্লাসনস্ত এবং প্যারেস্ত্রৈকা। গ্লাসনস্ত সরকার এবং পার্টিতে সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। অপরদিকে প্যারেস্ত্রৈকা অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। আমদানী হয় দেশী বিদেশী পুজির। অল্পদিনের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মূল শক্তি এবং তৃতীয় বিশ্বের প্রধান আশ্রয়স্থল সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু দেশে পরিণত হয়। ক্রমে দেশের মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পুরনের জন্য সোভিয়েত সরকারকে মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভর করতে থাকে। গর্বাচভ দেশকে মার্কিনদের হাতে বিক্রি করে দিয়েও বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নাটক, তারপর ক্ষমতায় চলে আসে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান দোসর ইয়েলেতসিনে। ইয়েলেতসিন অকপটে স্বীকার করেন তিনি কোনদিন কমিউনিস্ট ছিলেন না।

ইয়েলেতসিন ক্ষমতার আসার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটায়। বিলুপ্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। জন্ম নেয় স্বাধীন রাশিয়ার। এই ব্যবস্থা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পায়। বিগত তিন বছরে সমাজতন্ত্রের বিলুপ্তি হয়েছে পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি দেশে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের বিলোপের প্রধান কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের জীবন যাত্রার মান যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের মান উন্নত করতে পারেনি কেন? নতুন ব্যবস্থা কি কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে? সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কি কি প্রভাব বিভিন্ন বিষয়ে দেখা যাচ্ছে?

কেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সোভিয়েত জনগণের মান উন্নত করতে পারেনি এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও দেশরক্ষা খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ চালিয়ে গেছে এর কোন প্রয়োজন ছিল কিনা এই বিষয়ে আরও পর্যালোচনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। যখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির প্রতিরক্ষাখাতে ব্যায় জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫।৬ ভাগ সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই খরচ শতকরা ৩০।৩৫ ভাগ। বিপ্লবের পর ১৫টি ভিন্নজাতি বলশেভিক পাটির নেতৃত্বে এক সোভিয়েত রুশ জাতীয় সরকার গঠন করলে এদের মধ্যে কখনই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়নি। এটিও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা। তৃতীয় ধর্ম। ধর্মীয় বিশ্বাস কেবলমাত্র স্বেচ্ছারই ত্যাগ করা সম্ভব। ধর্মীয় উন্মাদনা ত্যাগ করতে কেবল রশিষ্ঠ আদর্শই শক্তি যোগাতে পারে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এশিয় ভূ-খণ্ডের প্রজাতন্ত্রগুলিতে যে ভাবে চার্চ এবং মস্‌জিদ ফিরে আসছে তাতে অনুমান করা যায় মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা পাটির ভয়ে সংযত করে রেখে ছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয় অনেকটাই সোভিয়েত সরকারের সহায়তায়। ক্ষমতা দখলের সময় যারা পাটির নেতৃত্বে ছিল ওরাই অনেক জায়গায় সরকারের প্রধান হয়। কিন্তু তখন দুর্বল পাটির নেতৃত্বও ছিল দুর্বল। ফলে দুর্বল নেতৃত্ব সরকারের ক্ষমতায় আসে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল সোভিয়েত সরকারের উপর। সোভিয়েত সরকারের ব্যর্থতার দায়ভারই বইতে হয়েছে পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক সরকারকে। তাই সোভিয়েত সরকারের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন হয় পূর্ব ইউরোপের প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে। পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, মোঙ্গোলিয়া, প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবসা চালু করা হয়। ব্যবস্থা করা হয় ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের। পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে মিলিত হয়।

বিগত তিন বছরের খতিয়ানে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যার কিছু সমাধান হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ

হয়েছে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। গত তিন বছরে রাশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতির হার হয়েছে এক হাজার গুণ। হতাশা, দুর্নীতি, ব্যভিচার গোটা রুশ সমাজকে গ্রাস করেছে। একই অবস্থা প্রজাতন্ত্রগুলিতে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে তিন বছর জার্জিয়ায় তিন বার সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। লিথুয়ানিয়া মোঙ্গোলিয়ায় আবার কমিউনিস্টরা সরকারে ফিরে এসেছে। পোলাণ্ডেও কমিউনিস্টরাও ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। বুলগারিয়াতে সমাজতন্ত্রীরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় ফিরে আসার অর্থ এই নয় যে আবার সমাজতন্ত্র কায়েম হতে চলেছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য বাজার অর্থনীতি বা অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ সোভিয়েত বা অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সমস্যা কিছু মাত্র লাঘব করতে সমর্থ হয়নি। বরং সমস্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যে সামাজিক নিরাপত্তা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল আজ তা অবলুপ্ত হয়েছে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার মত সামাজিক পরিকাঠামো এবং ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি হয়নি। একদিকে সরকার মুখাপেক্ষী হচ্ছে মার্কিন সাহায্যের উপর অপরদিকে মার্কিন এবং জার্মান বহুজাতিক সংস্থা পাচ্ছে নতুন বাজার ঐ সব দেশে। ফলে দেশের পুরানো সংস্থার অবস্থার ক্রমে অবনতি হচ্ছে। এখন আর রাশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের দেশে ভোগ্য পণ্যের অভাব নেই। জার্মানি, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভরে দিয়েছে ওদের বাজার। কিন্তু এসব হবে ডলারে। রুশ দেশে রুবলের কোন মূল্য নেই। বিদেশী মদ দেশী নারী সব কিছুই পাওয়া যায় ডলারের বিনিময়ে। রুবলের বিনিময়ে মিলতে পারে হয়ত কিছু শুকনো রুটি। গত তিন বছরের অভিজ্ঞতার ওদেশের মানুষ বুঝতে পারছে বিদেশী পুজি আসবে মুনাফা লুটতে, দেশের অর্থনীতি এতে এগুবেনা। বিদেশী সাহায্যও পারবেনা অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে। এই গোলকধাঁধার আবর্তেই পরিবর্তন হচ্ছে সরকারের।

পূর্ব ইউরোপে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে জাতিগত সমস্যা। সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু দ্বিধা বিভাক্তই হয়নি চলছে জাতিগত সংঘাত। যারা গত ৭৪ বছর একসঙ্গে এবং শাসন ব্যবস্থায় লালিত পালিত হয়েছে তারাই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। বিভক্ত হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া। চেক এবং শ্লোভাকিয়া। ইতিহাসের লজ্জা যুগশ্লাভিয়া। একটি দেশ তিনটি জাতি— সার্বিয়ান, ক্রোয়েসিয়ান মুসলিমস, চলছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

অমানবিক অত্যাচার। হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে—নারী ও শিশুকে, কারণ ওরা ভিন্ন জাতের। বন্দীদের উপর চলছে জেলে নির্মম অত্যাচার। ওদের অপরাধ কোথাও ওরা মুসলিম আবার কোথাও ওরা বোসনিয়ান। এই জাতি দাঙ্গা ব্যাপক পৃথিবীর বহু উন্নয়নশীল দেশে। পশ্চিমের কিছু উন্নত দেশ ওদের সংকট যত আমাদের উপর চাপাচ্ছে তত দেখাদিচ্ছে জাতি দাঙ্গা। উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক সংকট এবং জাতি দাঙ্গার সমাধানের পথ একই সঙ্গে খুঁজতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া আজ সঙ্কুচিত। কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন বাকী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়েছে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন এবং বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদ প্রচার ও শিক্ষার আন্দোলন।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল কিউবা। নানাভাবে সোভিয়েত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল কিউবা। সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন ছিল মার্কিন আক্রমণের হাত থেকে কিউবাকে রক্ষা করার জন্য। কিউবার খাদ্যের অভাব পুরণ করতো রাশিয়া। সোভিয়েত সরকারের বিলুপ্তির পর নতুন রুশ সরকার মার্কিন অনুগ্রহ পাবার জন্য কিউবার জন্যে বরাদ্দ সব রকম সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। সারাবিশ্বের সংগ্রামী মানুষের শুভেচ্ছায় এবং সহায়তায় কিউবার মানুষ রাশিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। কিউবা সারা বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু করেছে। নতুনকরে অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরী হচ্ছে। অসহায় অবস্থার সুযোগে আমেরিকার পক্ষেও সম্ভব হয়নি কিউবাকে গ্রাস করা। সোভিয়েত সরকারের দুর্বলতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নতুন পথে বাঁচার চেষ্টা করছে চীন কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম। শুধু শোষণের অবসান ঘটালে হবেনা বণ্টনে সমতা আনলেও হবেনা। বাড়াতে হবে সম্পদ এবং সেই সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্যে। একসঙ্গে খাটছে ব্যক্তিপুঁজি এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজি। একই সঙ্গে চালু হয়েছে সরকারী বাজারের পাশাপাশি বেসরকারী বাজার। উন্মুক্ত করা হয়েছে বেশী রোজগারের পথ বরং পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়কে ব্যয় করার পথও। পুরনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের আয় এবং ব্যয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই পরীক্ষার ফলে সমাজতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণা শুরু হয়েছে এর ফলে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হবে আরও শক্তিশালী।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া দুর্বল হওয়ায় তৃতীয় বিশ্বও হীনবল হয়েছে। পুঁজিদেশেও সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ প্রস্তুতি বজায় রাখা আর যুক্তি গ্রাহ্য হচ্ছে না প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে ব্যয় কমাতে হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে আঘাত আসছে। এখন পুঁজিবাদী দেশগুলো নিজেদের বাঁচার তাগিদে বিশ্বজোড়া প্রচার চালাচ্ছে বাজার অর্থনীতির পক্ষে। বাজারে প্রতিযোগিতায় যার টিকে থাকার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র সেই টিকে থাকবে। ভর্তুকী দিয়ে কাউকে বাঁচানোর দরকার নেই। তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সীমিত ক্ষমতার ক্ষুদ্র আকারের পুরনো আমলের কারখানা। আর এদের জায়গা দখল করছে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা। দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হচ্ছে। অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিচ্ছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে শুধু আর্থিক দিক দিয়ে নয় রাজনৈতিক দিক দিয়েও গ্রাস করার চেষ্টা করছে। যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অংগুলি নির্দেশে চলবে না তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। পারশ্য উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা ইরাককে সামরিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বে এখন আমেরিকার কোন কাজের বিরোধিতা করার শক্তি আর কারোর নেই। আমেরিকা চায়নি রাশিয়া ভারতের সঙ্গে ক্রায়োজেনিক রকেট চুক্তি বজায় রাখুক। তাই রাশিয়া এই চুক্তি বাতিল করেছে। ভারত এর বিরোধিতা করেছে। ভারত এখনও ডাঙ্কেল ড্রাফ্ট অনুমোদ করেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভাষণকালে কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে ভারতকে বুঝিয়ে দিয়েছে এখন আমেরিকার সঙ্গে একশ-ভাগ সহমত পোষণ করা ছাড়া উপায় নেই।

পুঁজিবাদীরা নিজের দেশে সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। খোদ মার্কিন দেশে শিল্পে মন্দা চলছে। গ্রেট ব্রিটেন বেকারত্বের চাপে ধুঁকছে। তৃতীয় বিশ্বে কোন দেশের পক্ষে পুঁজিবাদী পথে এগিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। আমেরিকা বা জার্মানি আমাদের দেশে মত পুঁজি বিনিয়োগ করুক তাতে আমাদের দেশের মানুষের জীবন

যাত্রার মান উন্নত হবে না। দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারই দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। দেশের প্রধান সম্পদ দেশের মানুষ, যারা ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিযুক্ত করতে পারবে তারাই সফল হবে। নতুন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চেষ্টা করছে সরকারী এবং বেসরকারী পুঁজির সমন্বয়ে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অগ্রগতিকে তরান্বিত করা। সমাজতন্ত্রের পথই হবে মানুষের আগামী দিনের বাঁচার পথ। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরিক্ষার মধ্যে দিয়ে তৈরী করতে হবে সমাতন্ত্রের পথ। এটাই হবে আগামী প্রজন্মের বাঁচার রক্ষাকবচ।

।। আর্ত মহারাষ্ট্র, আর্ত ভারতবর্ষ ।।

ভূকম্পের এত ক্ষুধা !
এতগুলি নরমুণ্ড চায় !
ধ্বংস ও ধ্বসের ত্রাসে
পলাতক সব পাখিগুলি
এখানে মানুষ নেই
প্রাণহীন খাঁ খাঁ শূন্যতায়
খসে পড়ে ডট পেন
শুকিয়ে খটখটে সব তুলি
ধুলো ওড়ে—মরুভূমি
নিজেকে এখানে খুঁজে পায়
সমস্ত ভারতবর্ষ
জেগে আছে—স্তব্ধ বেদনায়।

—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বিশিষ্ট কবির ব্যতিক্রমী উপন্যাস

স্বপ্নভূমি ঃ মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

কুড়ি টাকা

মধ্যদুপুর প্রকাশনী

পূর্বাচল স্টেশন রোড / দত্তপুকুর / উ. ২৪ পরগণা, ৭৪৩২৪৮

ছায়াদেবী

পারমিতা ঘোষ

কপালে কাচপোকার টিপ, ঠোঁটে পানের লালিমা, পরনে ঝলমলে শাড়ি— প্রৌঢ়া এক বিলাসিনী রসিক শ্রোতাদের মাঝে আবেশে বুঁদ হয়ে গান ধরেছেন-- "ছল করে জল আনতে আমি যমুনাতে যাই" 'হারমোনিয়াম' ছায়াছবির এই সুবিখ্যাত দৃশ্যটির মধ্যমণি মক্ষীরাণীরূপে ছায়াদেবীর উপস্থিতি দর্শকদের স্মৃতি-সমুদ্রে আজও আবেগের ঢেউ তোলে। দৃশ্যটিতে তাঁর অভিনয় যেমন অবিস্মরণীয় তেমনি অবিস্মরণীয় তাঁর ওই "ছল করে জল..." গানটি। গানটির পরতে পরতে আছে মজলিসী মেজাজের ছোঁয়া আর সঙ্কোচহীন উন্মুক্ত আবেগের দৃপ্ততা।

ছায়া ওরফে কনকের ছোটবেলাটা কেটেছিল, পাশের বাড়ির বাবুকাকার অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সঙ্গীতসাধনার বাতাবরণে। সঙ্গীতের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র প্রেরণায় গান বেশ ভালই রপ্ত করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে তামিলও নিয়েছিলেন। তবে বেশ কিছু হিন্দি ও বাংলা ছবিতে প্লে-ব্যাক করেও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে নয়, অভিনেত্রী হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। অথচ চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের আগে অভিনয় ব্যাপারটার সঙ্গে ছায়ার তেমন কোন পরিচয় ছিল না। আসলে অভিনয়টা তাঁর সুপ্ত প্রতিভা—চর্চা ও মানসিক শক্তির প্রবল প্রয়াসে যা তিনি জাগাতে সক্ষম হয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করে চলেছেন ছায়া, তাই তাঁর অভিনীত চরিত্রের তালিকাও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। বড় পর্দায় তাঁর উপস্থিতি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্ল্যামার চুঁইয়ে পড়া নায়ক-নায়িকাদেরও ম্লান করে দিয়েছে। আসলে যে কোন চরিত্রের সঙ্গে অনায়াসেই মিলে যেতে পারেন তিনি, তাই তাঁর অভিনীত যে কোন চরিত্রই হয়ে ওঠে জীবন্ত। যেকোন ছায়াছবিতে মূল নায়িকার অনেক সুযোগ থাকে নিজেকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার। তাই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ে সাফল্যের কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চরিত্রাভিনেত্রী ছায়ার দিকেই তাকানো যাক না।

সূচনায় উল্লিখিত 'হারমোনিয়াম' ছায়াছবির ছায়ার সঙ্গে বিস্তর ফারাক

রয়েছে রাজা রামমোহন-এর মা অর্থাৎ জগত্তারিণীরূপী ছায়ার। একদিকে নারীর মোহিনী শক্তি, অন্যদিকে নারীর আদ্যাশক্তি—দুই রূপেরই প্রকাশে ছায়াদেবী চরম সার্থক। জগত্তারিণী চরিত্রটিতে একদিকে সন্তান, অন্যদিকে ধর্ম, একদিকে স্নেহ ভালবাসা অন্যদিকে ধর্মীয় আচার নিষ্ঠা—এই টানাপোড়েনের যাঁতাকলে পিষ্ট, দলিত মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার মূর্ত প্রতীকরূপে দেখা দিয়েছিলেন ছায়া। সমগ্র ছবিতে তাঁর অভিজাত উপস্থিতি স্মৃতির আকাশে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

একধরণের দৃপ্ততা আছে ছায়াদেবীর চরিত্রে। আর সেই দৃপ্ততা যথেষ্টই প্রভাব ফেলেছে তাঁর অভিনয়ে। 'সাত পাকে বাঁধা' ও 'সপ্তপদী' দুটি ছবিতেই ছায়াদেবী সুচিত্রা সেন-এর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। দুই মায়ের চরিত্র দুই রকম—প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মীই বলা যায়। দুজনেই সন্তানের সুখ চান তবে দুজনের প্রয়াস দুরকমের। একজনের মধ্যে নিজেকে জাহির করার চেষ্টাটা বড্ড বেশি, অন্যজনের মধ্যে সংসারের এককোণে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতাটা বেশি। একজন যতটা সরব অন্যজন ততটাই নীরব। কিন্তু দুটি চরিত্রেই ছায়াদেবীর চারিত্রিক দৃপ্ততার ছাপ লক্ষ্য করা যায়—'সাত পাকে বাঁধা'য় নিজের দৃষ্টিকোণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দানে এবং 'সপ্তপদী'তে সন্তানের মুখ চেয়ে, সমস্ত অপমানকে মাথা পেতে গ্রহণ করার মানসিক শক্তিতে। সপ্তপদী-র এই শান্ত, সমাহিত জননীমূর্তিটিরই বিশাল ব্যাপ্তিময় প্রকাশ দেখি, 'কাচের স্বর্গ' ছবিটির সেই বৃদ্ধা মেট্রনটির মধ্যে যে, চরিত্রে ছায়াদেবী অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এক প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব।

খুব ছোট চরিত্রেও অভিনয় করেছেন ছায়া, কিন্তু সেই পরিমাণগত ক্ষুদ্রত্বকে ছায়া তাঁর অভিনয়ের বিশাল উচ্চতায় ভরিয়ে তুলেছেন। 'দেবী চৌধুরানী'র সেই নথতুলনি শাশুড়ীমাতার চরিত্রটিকেই ধরা যাক না, সামান্য উপস্থিতিতে অসামান্য অভিব্যক্তিতে ছায়া অনায়াসেই ফুটিয়ে তোলেন বনেদী সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রীটির রূপ। কিংবা 'ধনরাজ তামাং'এর দেহাতীবৃদ্ধার চরিত্রটির কথাব ভাবা যাক না—কী দাপটের সঙ্গেই না অভিনয় করেছেন তিনি। ধনরাজ তামাং-এর বিয়ের উৎসবে তাঁর সেই কোমর দোলানো কিংবা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ধনরাজের স্ত্রীর সম্মানরক্ষার চেষ্টা ভোলার নয়। আসলে বাস্তবানুগ অভিনয় করতে জানেন

ছায়াদেবী, ফলে তাঁর অভিনীত কোন চরিত্রই আমাদের খারাপ লাগে না। এই কারণে রূপকথার ডাইনীকে আমাদের বোধ-বুদ্ধি অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেও, 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা'র ছায়া অভিনীত সেই ডাইনী চরিত্রটিকে আমাদের জীবন্ত ও বাস্তব বলেই মনে হয়। গতানুগতিক ধারায় পড়ে না এমন কিছু চরিত্রেও অভিনয় করেছেন ছায়াদেবী। তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'পদিপিসীর বর্মীবাক্স'এর পদিপিসীর চরিত্রটি। এককথায় অসামান্য অভিনয়—ছোট-বড় সকলকেই তাজ্জব করে দেওয়ার মতো অভিনয় করেছিলেন ছায়াদেবী। তাঁর সেই কোমরে আঁচল গুজে, চোখ পাকিয়ে বড় বড় পা ফেলে ডাকাতদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দৃশ্যটি কিংবা ডাকাত সর্দারের চোখের সামনে তারই লুণ্ঠিত টাকা ওড়ানোর দৃশ্যটি স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত করে রেখে দেবার মত। এই লঘুধর্মী, মজাদার চরিত্রের পাশাপাশি মনে পড়ে 'আপনজন'এর গ্রাম্যবৃদ্ধার অত্যন্ত গভীরতাপূর্ণ চরিত্রটি—শহুরে কৃত্রিমতার বাঁধন ছিঁড়ে যিনি অনায়াসে আপন করে নেন তথাকথিত সমাজবিরোধীদের। কারণ এইসব সমাজবিরোধীদের কোন মুখোস নেই—ভেতরে বাইরে এরা এক, তার ওপর কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এরা মার্জিতসমাজানুগদের চাইতে অনেক বেশি মানবিক,পারিপার্শ্বিকতাই তাদের কুপথে নিয়ে গেছে। এইসব বেপথু যুবকদের শাসনে, ভালোবাসায় সঠিকপথে ফেরাবার চেষ্টা করেছেন সেই মাতৃরূপী বৃদ্ধা—সহজ-সরল অভিনয়ে চরিত্রটিকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে তুলেছেন ছায়াদেবী।

—বাংলা ছায়াছবির রঙিন আকাশে কত নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটল, কত নক্ষত্র আবার খসেও গেল, তবু প্রায় চার যুগেরও বেশি সময় ধরে ছায়া নক্ষত্রের স্থানচ্যুতি ঘটা তো দূরে থাক, দীপ্তিটুকুর পর্যন্ত হেরফের ঘটল না। ম্যামার নয় বাস্তবানুগ অভিনয়টাই তাঁর মূলধন। তাই বয়সবৃদ্ধির ব্যাপারটা তাঁর কাছে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। যত বয়স বেড়েছে চেহারাটা ততই ভেঙেছে ঠিকই কিন্তু অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়ে খেয়ে অভিনয়টা আরো পোক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ে রসিক দর্শকের মনে ছায়াদেবী একটা নিশ্চিত স্থান করে নিয়েছেন। তাই সাম্প্রতিকতম ছবিতে তাঁর অনুপস্থিতি বড্ড চোখে ঠেকছে, বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর মত অভিনেত্রীর প্রয়োজন যথেষ্ট—তাই বাংলা চলচ্চিত্রের দিগ্‌-দিগন্তকে দৃপ্ত অভিনয়ে আবার উজ্জ্বল করে তুলবেন ছায়া, এমন স্বপ্ন আমরা দেখেই যাবো।

সুচিত্রা মিত্র

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য

আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছাত্রী হিসেবে সুচিত্রাদির সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবং তখন থেকেই সুচিত্রাদি আমার প্রাণের মানুষ। যদিও তাঁকে ভালোবাসার সূত্রপাত আরো অনেক আগে থেকেই—যখন তাঁকে চোখে দেখিনি। আমাদের বাড়ীতে বরাবরই গানের পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশে ছোটবেলা থেকেই গান গাইতাম, গান ভালবাসতাম। বাড়ীতে বেশ বড়ো-সড়ো 'হিজ মাস্টার ভয়েজ' লেখা একটী দম দেওয়া গ্রামোফোন ছিল এবং একটী নীচু আলমারি ভর্ত্তি রেকর্ড—যেখানে আঙুরবালা থেকে শুরু করে বহু নামকরা গাইয়ের গানের রেকর্ড ছিল। এই বিপুল সংখ্যক রেকর্ডের সঙ্গে আমার অবদানে সংযোজিত হোল সুচিত্রাদির গান। ১৯৪৯/৫০ সাল থেকে (যখন আমার বয়স ১১/১২) আমি নিজেই ঠিক করতাম কোন গানের রেকর্ড কিনব। সেই বয়সেও আমার সিদ্ধান্ত বিশেষ কারো পরামর্শের ধার ধারতো না। গান শিখতাম—সবরকম গান, গানের শিক্ষিকার কাছে—বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার সুযোগ ছিল না।

কোলকাতায় এলাম এম এ পড়তে আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হোল গান শেখা। 'কবিতীর্থ' নামক শিক্ষায়তনটী কোন জায়গায় জেনে নিয়ে গেলাম সেখানে। গিয়েই শুনতে পেলাম সুচিত্রাদির কণ্ঠে গান—'মনে রবে কিনা রবে আমারে'—কোন একটী গ্রুপকে শেখাচ্ছিলেন। ভর্তি হোলাম। আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে নতুন একটী গ্রুপ তৈরী হোল। সপ্তাহে দুদিন—শনিবার বিকেলে আর রবিবার সকালে। ওই দিন দুটো যে কী আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটত বলার নয়—মনে হোত সুরের সাগরে অবগাহন করছি। সুচিত্রাদি এসে প্রথমেই পুরো গানটী ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতেন। ছিপছিপে মানুষটী বোর্ডের একেবারে ওপরের দিকে লেখার সময় পা দুটী সামান্য উঁচু করে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে গানটী লিখতেন তালের দাগ সহ। আমরাও খাতায় সেটী তুলে নিতাম। গীতবিতান দেখে গান গাওয়ার চল ছিল না। সুচিত্রাদি গাইতেন—আমরাও

সুরের সামান্য ভুল-ত্রুটী বারে বারে সংশোধন করে দিতেন। একটী সামান্য মীর বা মোচড় যতক্ষণ প্রত্যেকের গলায় না উঠত ততক্ষণ শেখাতেন। মজা করে ভুলগুলি নকল করে সংশোধন করতেন। আর ছিল উদাহরণ—আমরা জানতাম 'হৃদয়' কখনোই 'রিদয়' নয়, অথবা 'বজ্রে' কখনোই 'বজ্‌রে' নয়, অথবা কোন পংক্তির শেষের 'উ', 'ই', 'র' কখনোই গিলে ফেলা যাবে না—যথাযথ সুরে লাগিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। কখনো বা বকতেন—কিন্তু সেই বকুনি কখনোই ব্যক্তি 'আমি' কে আঘাত করেনি। গভীর ভাবে ভালোবাসতে পেরেছিলাম 'সুচিত্রাদি' নামের মানুষটীকে। কি করে আরো একটু ভাল গান করে তাঁকে খুশী করতে পারব সেটাই ছিল বড় কথা।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব আয়োজিত হত প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ। এক বিরাট খোলা মাঠে সমস্ত ছাত্রছাত্রী লাইনের পর লাইন দিয়ে বসত। আর সবার পিছনে থাকতেন সুচিত্রাদি। দ্বিজেনদা (৺দ্বিজেন চৌধুরী) তবলা, তানপুরা এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহ নানান কলাকুশলীর দল। আমরা সবাই সুচিত্রাদির দিকে পিছন ফিরে বসে (বেশি এদিক-ওদিক তাকানো, গল্প করা চলতো না) একটী সুরের সঙ্কেত বা বাজনার সঙ্কেত দেওয়া হোত গান ধরার জন্য। গান ধরতে হবে সবাইকে একই সঙ্গে—এজন্যেও কতো অনুশীলন করাতেন। কী অসাধারণ, অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন সবাইকে একই লেভেল-এ নিয়ে আসার জন্যে—যাতে কোথাও বেসুরো কিছু না হয়। এইসব রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে আমাদের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ছিল—আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলে সুচিত্রাদির গান একটীর পর একটী—এছাড়াও কোন বিশেষ অতিথির অনুষ্ঠানও হোত। সেই সময়ই আমি শুনেছি সুচিত্রাদির অসাধারণ আবৃত্তি। সেই আবৃত্তি ছিল যেন রঙ তুলির সাহায্যে ছবি আঁকা। শম্ভু মিত্র ছাড়া আর কারো কণ্ঠে এমন আবৃত্তি শুনিনি। অপ্রয়োজন গলা কাঁপিয়ে যে আবৃত্তির রেওয়াজ তার থেকে উত্তরণ আমি শুনেছি সুচিত্রাদির কণ্ঠে। পরে 'শাপমোচন' এর রেকর্ড-এও সুচিত্রাদি আবৃত্তি করেছেন—

সেই আবৃত্তি শুনতে শুনতে আজও আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়—এটী একেবারেই অতিশয়োক্তি নয়—নিছক বাস্তব।

আমি কর্মসূত্রে গানের জগতের সঙ্গে যুক্ত নই। কিন্তু গানই আমার প্রাণ। বলা ভালো সুচিত্রাদির গানই আমার প্রাণ। সুচিত্রাদির গান কানে এলেই আমার সমগ্র চেতনা উন্মুখ হয়ে ওঠে। আমার মনের তন্ত্রীগুলি ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই সুরে। যে কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিশ্চয়ই সুখকর অনুভূতি বয়ে আনে কিন্তু সুচিত্রাদির গানের ধরন আলাদা । সুচিত্রাদির গানে আমি ডুবে যাই এক অবিস্মরণীয় আনন্দের মধ্যে।

কল্লোল

নীহার মজুমদার

উত্তাল সমুদ্রের কল্লোল স্তব্ধ হয়ে গেল, চিরতরে। ভারতীয় সিনেমা আর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন উৎপল দত্ত। আজকের দিনে ৬৪ বছর বয়সটা কোন বয়সই নয়। একজন আগা-গোড়া খাঁটি ও নিষ্ঠাবান অভিনেতার প্রস্থান ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। হাল আমলে রঙ্গমঞ্চ নিবেদিত এমন নাট্যগুরুর বিয়োগ ব্যথা সহজে ভুলবার নয়। সমালোচকেরা উৎপল দত্তের জীবনদর্শনে রাজনীতির গন্ধ মাখিয়ে তাঁকে সমায়ন্তরে খাটো করার চেষ্টা করেছে —অকারণেই। নাটক, অভিনয়কলা এবং অভিনেতার সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চে যে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় তা তো সমাজদর্পন বিশেষ। উৎপল দত্তের নাটকগুলি নিয়ে নাট্যালোচনা করলে দেখা যাবে তিনি যেন সমাজসংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় করে গেছেন। আর রাজনীতি? সে তো মতভেদে আপেক্ষিক ব্যাপার। কিন্তু সবার উপরে মানুষ; মানুষের কথাকে অগণিত জনসমুদ্রে প্রচার করা, উপস্থাপন করে জনমত গড়ে তোলা তো প্রতিটি অভিনেতা নাট্যকর্মী ও সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার বিশেষ। উৎপল দত্ত সে কাজই করে গেছেন, তিলে তিলে নিখাদ নিঃস্বার্থভাবে। নাটক নামাতে গিয়ে তাঁর বহু দিন বহু রাত আহার জোটেনি, হল ভারা গুণতে তাঁকে হাত ঘড়ি বেচতে হয়েছে। মানুষের কথা মানুষকে জানাতে তিনি সবচেয়ে সস্তায় কষ্ট করে আর্থিক দায়িত্বের বা ক্ষতির বোঝা কাঁধে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে গেছেন। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর সম্ভাবনাময় লিট.ল থিয়েটার গ্রুপ একটি মাইলস্টোন বিশেষ। পাঁচের দশকের গোড়া থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রদীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত রেখেছিলেন। বিগত শতকের স্বদেশী রক্ষণশীলতা-বিরোধী বক্তব্য থেকে শুরু করে বিদেশী রাশিয়ান এবং অন্যান্য পাশ্চত্য নামী নামী নাটককে তিনি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে বামপন্থী

ব্যক্তিত্বের নাট্য জিজ্ঞাসায় ঘুরে ফিরে বামঘেঁষা বক্তব্য উপস্থাপিত হবে— এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিতর্কও অমূলক।

নাট্য সাধনার পথে তাই তাঁকে এই প্রশ্নে বার বার বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বক্তব্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং অভিনয়কলার সময়য়ে তিনিও অগ্নিপরীক্ষায় সকলের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন বারবার। পৃথিবীর নাটকের ইতিহাস, হালফিলের অভিনয়-আঙ্গিক, দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চে আধুনিকতা ইত্যাদি নিয়ে উৎপল দত্তের পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতা আকাশ ছোঁয়া। বিদগ্ধ এই নাট্যকারের নিজস্ব পাঠাগার এবং সাহিত্য নিয়ে সম্যকজ্ঞান অসীম। লিটল থিয়েটার গ্রুপের সদস্যদের তিনি প্রায়ই বলতেন নাটক করার আগে দুনিয়ার নাটক ও তার ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করা প্রাথমিক কর্তব্য। একথা আজ ক'জনইবা মানেন! স্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পেতেন, দেখা যেত বই-এর মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তিনি পড়াশুনা নিয়েই রয়ে গেলেন এবং এই পড়াশুনার ফসল তুলে তিনি বারবার সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন নাটক, করেছেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নব নব বিতর্কের।

উৎপল দত্ত বিদেশী নাটককেও ঘরের কোণে এনে অভিনয় করেছেন। প্রখ্যাত সোভিয়েৎ (তদানীন্তন) নাটক 'দ্য রাশিয়ান কোশ্চেন' অবলম্বনে তিনি উপস্থাপন করলেন 'সাংবাদিক'। সেক্সপীয়র-এর নাটকগুলি যেমন ম্যাকবেথ, ওথেলো, মিডনাইট সামস ড্রিম, বার্ণার্ড শ'র পিগমিলিয়ন এবং ব্রেখ্‌টীয় চিন্তাধারা— কোথায় না তাঁর অবাধগতি ? সবচেয়ে আশ্চর্য এবং প্রশংসার কথা যে তিনি বিশেষকরে বিদেশী নাটককে সুদূর গ্রাম গ্রামান্তরে অত্যাত নিরলস গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিচিতি করানোর মত দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

যে কোন স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য আবশ্যিক ভাবেই উদ্দেশ্যমূলক। এখন দেখতে হবে সেই উদ্দেশ্য কতটা সমাজমুখী বা বাস্তববাদী। এহেন ক্ষেত্রে উৎপল দত্তকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কোন কারণ নেই। সমাজের অন্যায়, অবিচার, স্বেচ্ছাচারিতা এবং মাৎস্যন্যায় নিয়ে উৎপল দত্ত ভিন্ন আঙ্গিক ও রসচেতনায় নতুন নতুন নাটকের জন্ম দিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ।

মার্কসীয় চিন্তায় পরিশীলিত নাটকের মাধ্যমে উৎপল দত্তকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথও সমান ভাবে প্রচার পেয়েছে। একদিকে মার্কসীয় চেতনা, আবার ব্রেখ্‌টীয় প্রভাব, ম্যাক্সিম গোর্কির প্রেরণা ও রাবীন্দ্রিক অনুভূতি ও শেক্সপীয়র নিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো এমনই বিচিত্রতর নাট্যযাত্রা উৎপলবাবুর। তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন পুরোপুরি বামপন্থী চেতনা নিয়ে। 'অঙ্গার'-এ দেখিয়েছেন কয়লাখনির শ্রমিকজীবনের করুণগাথা। 'কল্লোল' নাটকে দেখছি ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। সমকালীন রাজনীতি ও তৎকালীন সরকারের কোপে 'কল্লোল' নিয়ে নানান বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তরুণ সম্প্রদায় বিশেষকরে ছাত্র রাজনীতিতে এই নাটক এক নতুন প্রেরণার শুভসূচনা করে। কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ শাসক গোষ্ঠির ক্রোধের শিকার হয়। এতশত করা সত্ত্বেও কল্লোল নাটকের শো একদিনও বন্ধ হয়নি। উৎপল দত্ত ছাড়া পান ছয় মাস পর। কাগজে (একমাত্র 'দ্য স্টেটসম্যান' ছাড়া) বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়। এতে হিতে বিপরীত হয়েছিল।

রাজনৈতিক নাটক প্রসঙ্গে তাঁর আপোষহীনতা সম্বন্ধে আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা হল 'তীর' নাটক। সেসময় নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে এ রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। রোজ রক্তলীলার ঘটনা ছাপা হচ্ছিল কাগজে। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অঞ্চল তখন লাল দুর্গবিশেষ। এদের আন্দোলনে সরকার বিরোধিতা করল। চলল গোলাগুলি এবং কৃষক হত্যালীলা। উৎপল দত্তের কাছে এ ঘটনা এক বেদনা বিধুর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। কৃষক আন্দোলনের পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করলেন, যার নাম 'তীর'। ত্রিশ দশকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রশংসনীয় উজ্জ্বল দিক নিয়ে নাটক তৈরি হল 'ফেরারী ফৌজ'। সামাজিক সমস্যা নিয়ে লিখলেন ও মানুষের অধিকারে। জেলে মেছোনীদের দুঃখময় জীবন সংগ্রাম নিয়ে সফল নাট্য প্রয়াস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অবক্ষয়িত সমাজের স্বেচ্ছাচারের দলিল 'টিনের তলোয়ার'। অভিনয় ক্ষেত্রে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' নাটকে ভক্তপ্রসাদ, 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রে উৎপল দত্তের অভিনয় শৈলীর কথা

চিরস্মরণীয়। পাশাপাশি চলল ইবসেন-এর ঘোস্ট এবং ডলস হাউস, গোর্কির লোয়ার ডেপথ্, গিরিশচন্দ্রের সিরাজ-উদ-দৌলা, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, তপতী ও অচলায়তন।

কল্লোল নাটক উৎপল দত্তের অন্যতম সেরা উপহার। উদ্দেশ্যমূলক এই নাটকের আঙ্গিকেও যুগান্তকারী বিপ্লব আনে। আগেই বলা হয়েছে এর রাজনৈতিক বিতর্কের কথা। কংগ্রেসীরা বলল যে এ নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তেমন করে দেখানো হয়নি, কম্যুনিষ্টরাও নাটকের দর্শনকে ভালোভাবে নেয়নি। তবু বাংলা নাটকে নতুন জোয়ারের সঞ্চার করেছিল। এর ৫০০ তম অভিনয়ের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল শহীদ মিনারের তলায়। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনের অবসানে বামপন্থী দলগুলির জোরদার জনমত গঠনের ইতিহাস সকলেরই জানা। ঐ জনমত গঠনে যিনি রাস্তার মোড়ে মোড়ে দিনের পর দিন পথনাটিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পথটি মন্থন করে দিয়েছেন তিনি সেই উৎপল দত্ত। সেময় আমাদের ছাত্রাবস্থা। নির্বাচনের আগে কলকাতার রাস্তার মোড়ে অভিনীত হত 'দিন বদলের পালা'। তারপর জনপ্রিয় নাটক অজেয় ভিয়েৎনাম, লেনিনের ডাক, বর্গী এলো দেশে, টিনের তলোয়ার, সূর্য শিকার, ঠিকানা, ব্যারিকেড, দুঃস্বপ্নের নগরী, এবার রাজার পালা, লেনিন কোথায়, তিতুমির, ষ্ট্যালিন ১৯৩৩, শৃঙ্খল ছাড়া, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, দাঁড়াও পথিকবর, অগ্নিশয্যা, নীল সাদা লাল, লাল দুর্গা, একলা চলোরে, দৈনিক রাজার পত্রিকা, জনতার আফিস, ক্রুশবিদ্ধ যীশু ইত্যাদি। এই সকল নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের কুসংস্কার, স্বেচ্ছাচারিতা, বাবু কালচার, ভোগ বিলাসিতার প্রতি কটাক্ষ স্বাধীনতা ও মুক্তির দলিল, গান্ধীর আত্মত্যাগ, মাইকেল জীবনী, রাজনৈতিক হঠকারিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা, মার্কস শতবার্ষিকী, লেনিন দর্শন জীবন্ত ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নাট্য ইতিহাসে এমন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া বিরল।

সত্যজিৎ-তনয় সন্দীপ রায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলীতে বলেছেন, 'তিনি নিজে নাটক লিখতেন, পরিচালনা ও অভিনয় করতেন, নাটক দেখতে দেখতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অসাধারণ বক্তব্য, অসাধারণ অভিনয়। ঐরকম জমজমাট ব্যাপার আমার তো আর চোখে পড়েনি। মঞ্চকে উৎপলদা যেভাবে ব্যবহার করেছেন

আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি। এককথায় বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর।'

"প্রায় সাতচল্লিশ বছরের থিয়েটার জীবনের উৎপল দত্তের পরিচয় 'আমি বামুন নই, দেখলেন? আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই।' হয়তো আবার কয়েক দশক শেষে বাংলা থিয়েটার নিয়ে নাটক লেখা হবে— তখন হয়তো এই থিয়েটারওয়ালারাই হবে অন্যতম প্রধান চরিত্রের নাম। বহু নাট্যকার গবেষণা করবে তাঁর লেখনীর— অভিনেতা ধিরায় পড়বে ওই সতেজ শরীরটাকে কেমন করে আয়ত্তে আনবে তার ভাবনায়। হয়তো সেই নাটকটিও শেষ হবে 'নো সারেণ্ডার' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। প্রায় একশো'র বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন, নাটক বা যাত্রার পালা লিখেছেন সত্তর বা তার কিছু বেশি, নির্দেশনার কাজ করেছেন, এপিক থিয়েটারে প্রবন্ধ লিখেছেন, বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে দশটা বই লিখেছেন।"

[প্রতিদিন/১৯৯৩]

উৎপল দত্ত কেন, সংস্কৃতি জগতে সকলেই কমিটেড। উনিও কমিটেড, তবে আপোষহীন। তাই তিনি লেখেন এবং উপস্থাপনা করেন কল্লোল, বুড়ো শালিখের ঘারে রোঁ, লাল দুর্গ, ব্যারিকেড, এবার রাজার পালা, টিনের তলোয়ার, মানুষের অধিকার ইত্যাদি নাটক। এ সকল নাটক সর্বতোভাবেই উদ্দেশ্যমূলক— এসব নাটক মঞ্চাভিনয় থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষের জ্বালা যন্ত্রণার কথা, দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা, শোষণের জ্বালা, স্বৈরাচারের চরিত্রের জীবন্ত উপাখ্যান। উৎপল বাবুর নাটকগুলি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক। তেজস্ব বাংলার রাজনীতিতে সংস্কৃতিকে সুন্দর ভাবে মিলিয়ে দিয়ে জীবন ও সমাজের কালো দিকের কথা বলার বা তা উপস্থাপনে তাঁর মুন্সীয়ানা প্রশ্নাতীত।

বঙ্গ সংস্কৃতিতে বিশেষ করে নাট্যচিন্তায় উৎপল দত্তের ভূমিকা ঐতিহাসিক। স্বদেশীয়ানা, সমাজের দুষ্টক্ষত, তথাকথিত আধুনিক কালচার, বিদেশী এপিক্‌কে বাংলার মঞ্চস্থ এবং বিগত শতকের বাংলার চালচিত্র ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী মানবমুখী বিচিত্রতম ঘটনাপ্রবাহকে নাট্যমঞ্চে উপস্থাপন করে সমগ্র দুনিয়াকে তিনি প্রেক্ষাগৃহের চারদেয়ালের মধ্যে এনে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন— এ

এক নজীর বিশেষ। উৎপল দত্ত নাটকের লোক, নাট্যজগতেই এঁর বিচরণ। ইনি নাট্যশাস্ত্রের শিক্ষার্থী নিজেকে পরিচয় করানোয় বিশেষ উৎসাহবোধ করতেন। দুনিয়াব্যাপী নাট্য আন্দোলন তিনি চিরদিনই সহযোদ্ধা। আমরা তাই উৎপল দত্তকে নাটকের লোক বলে জানতে ভালবাসি, পছন্দ করি।

তাঁর চলচ্চিত্রজীবন নিয়ে নানান কথা শোনা যায়। বিশেষ করে হিন্দী সিনেমায় উৎপল দত্ত সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। একদল সমালোচক (নিন্দুক?) বলেন,নাট্যজগতে যাঁর মধ্যে এমন মার্কসীয় বিপ্লবের পরশ বা গন্ধ তিনি কি করে শুধু অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য হিন্দি ছবিতে চটুল অভিনয় করেন? কেন মুচলেকা দিয়ে বিদেশে পারি দেন? এসব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়ে গেছেন। বাংলা নাট্যজগতে নিয়মিত তাঁর জাতীয় টানকের মঞ্চাভিনয় সাধারণতঃ খুব একটা ব্যবসায়িক সাফল্যের মুখ দেখেনি। তদুপরি অধিকাংশ নাটক বাম রাজনীতি ঘেঁষা উদ্দেশ্যমূলক হওয়ায় মঞ্চাভিনয়ে তাঁকে ধারাবাহিক ভাবে চিরকাল প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি টানতে হয়েছে। এই ঋণভার বইতে গিয়ে তাকে বাধ্য হয়ে যে কোন রকম ব্যবসায়িক সিনেমায় অভিনয় করতে হয়েছে। বোম্বাই থেকে উপার্জিত অর্থে তিনি বাংলা নাটককে হৃষ্টপুষ্ট করায় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। তিনি পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে নিয়মিত বাংলা নাটকাভিনয়ে তার যে আর্থিক খেসারৎ দিতে হত তা লাঘবের জন্যই হিন্দি চলচ্চিত্রে যে কোন ভুমিকায় অভিনয়ে তার কোন মানা ছিল না। কারণ মুখ্য প্রয়োজন ছিল বাংলা নাটককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থসংগ্রহ।

বাংলা নাটকের কল্লোল ধারাকে স্রোতস্বিনী করে এবং জীবন নাট্যে ইতি টেনে উৎপল দত্ত চলে গেলেন। প্রস্থান হল এক বিদগ্ধ নাট্যকারের। এখন শুরু হয়েছে শূন্য আসন পূরণের সমীক্ষা, যা নিছক বাতুলতামাত্র।

মানুষ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কানাই পাকড়াশী

না, স্মৃতিচারণ নয়। একটা উপলব্ধি থেকে মানুষটাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমার জীবনের যে অভিজ্ঞতা, যে শিক্ষা, যতটুকু বোধ আমার সঞ্চিত হয়েছে তা একটা শিখর জয়ের দুঃসাহস রাখে না। তবু অভ্রংলিহ যে পুরুষ আমার স্মৃতির সামনে পর্বতের আকার নিয়েছে তাকে নতুন করে জানবার সাহস জাগে কারণ আমার সুদীর্ঘ জীবনের বহু বছর তাঁরই সান্নিধ্যে কেটেছে। বাকি জীবনটাও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব না এই আমার ধারনা।

যদিও বয়সে পাঁচ-ছয় বছরের বড় তবু ঘটনাচক্রে ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বিদ্যাসাগর কলেজে একই ক্লাসে গিয়ে হাজির হলাম। ক্লাসে ভাল ছেলেদের সঙ্গে বসে খুব আগ্রহ সহকারে অধ্যাপক শোভাময় ঘোষের ক্লাসে তার কথা শুনছি। হঠাৎ দেখি অধ্যাপক ঘোষ পেছনের দিকে বসা এক অপূর্ব কান্তি তরুণের প্রতি দৃষ্টি ফেলে ক্লাসে পড়ার অনেক কিছু জটিল বক্তব্য ব্যাখ্যা করে চলেছেন। যারা বইয়ের ওপর থেকে মুখ তুলতে অভ্যস্ত নয়, তাদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। অনেক সময় সেই তরুণ সটান দাঁড়িয়ে অধ্যাপকের অনেক বক্তব্যে পাল্টা প্রশ্ন করে চলেছে।

ক'দিনের মধ্যেই হেদোর ধারে তার সঙ্গে দেখা। কাছেই তার বাড়ি। চোখে দেখে মনের কথা বুঝতে তার দেরী হত না। বিকেলের দিকে কলেজ ফেরতা সে আমাকে সঙ্গী করে ফেলল। অনেক সময় দেশবন্ধু পার্কে বেড়াতে যাবার পথে আমায় বাড়িও পৌঁছে দিত। অভিভূত আমি অন্যান্য কলেজে এবং আমার নিজের কলেজে আমাদের স্কুলের থেকে যারা পড়তে এল তাদের অনেকেই আমার এই আশ্চর্য আবিষ্কার আকৃষ্ট করল। রমেন ব্যানার্জি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। খেলাধুলায় বেশ দর। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই বিশ্বনাথ যেন তাঁকে লুফে নিল। পরবর্তী কালের বহু ছাত্রনেতা তাকে কেন্দ্র করে তখনকার ছাত্র আন্দোলনের দুর্দিনের মধ্যে একটা কিছু গড়বার আকাঙ্ক্ষায় জড়ো হতে লাগল। বিদ্যাসাগর কলেজে নানা বিপ্লবী গোষ্ঠির ছেলেরা জড়ো

হয়েছিল। ফলে তার আঙ্গিনায় পুলিশের নজরও খুব। বিশেষ করে সহিংস বিপ্লবী দলে ছিল যারা তাদের প্রতি।

বিশ্বনাথ প্রথমে তার রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও, বিপ্লবী আদর্শ তাকে নিয়ে এল সমাজতন্ত্রী পথে। তার ব্যক্তিগত জীবন চরিতে হয়ত আরও বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। আমার যেটা বক্তব্য তা হল যখনই যে আদর্শ নিয়ে লড়েছেন, সেই আদর্শের প্রতি তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। বিশ্বনাথ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে যত না পরিচিত ছিল, ব্যক্তি হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে সে এক অবিস্মবাদী নেতাতে পরিণত হয়েছিল। প্রগতিশীল সমস্ত ছাত্র গোষ্ঠি তাকে সেই নেতৃত্বপদে বরণ করে নিয়েছিল। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে, বিদ্যাসাগর কলেজে ইউনিয়নের নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদের মধ্যে তাকে কোন এক ছাত্র গোষ্ঠির পক্ষ থেকে মারধোর করেছিল। সেই কথা শহরে ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গোষ্ঠির ছাত্ররা চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হল। শেষপর্যন্ত তাদের নেতারা এসে ক্ষমা চেয়ে বিরোধ মেটায়। আন্দামান বন্দী মুক্তি আন্দোলনে বিশাল বিশাল মিছিল হওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বনাথের বক্তৃতা ছিল এক অবিস্মরণীয় আকর্ষণ। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে লোকে শুনত। এই অভূতপূর্ব ছাত্রনেতা বহু ছাত্রের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাতো। তার সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়াত। শুধু ছাত্র নয়, তাদের পরিবারগুলিও তার দ্বারা নানা ভাবে উপকৃত হয়েছে।

যুক্ত বাংলার আমলে একেবারে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত এই ছাত্র নেতাকে তদানীন্তন পার্টি নেতারা বাংলার থেকে সারা ভারতের নেতৃত্বপদে উন্নীত করলেও সে তার মূলকে কখনো অস্বীকার করেনি। সারা ভারতে পার্টি নেতৃত্বে খুবই কম বয়সে অধিষ্ঠিত থেকেও ভারতের পূর্বাঞ্চলের বহু প্রদেশেই সে তার ব্যক্তিত্বের গভীর পরিচয় রেখেছিল যা এখনো অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। আসাম বা উড়িষ্যায় যখন সবে পার্টি গড়ে উঠেছে তখন এই তরুণ নেতা তার অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহ ঢেলে দিয়েছিলেন সেই রাজ্যগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে।

তারপর পার্টি রাজনীতিতে বহু দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে তাকে। নিশ্চিত হার জেনেও পার্টির নির্দেশে তাকে কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী

লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। সেখানে নিজের দাদা বা বিধান রায়ের মত প্রবাদ পুরুষকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে হয়েছে। হয়ত পার্টি মনে করেছিল বিশ্বনাথ ছাড়া পার্টির ভাবমূর্তি তুলে ধরার কেউ ছিল না।

পার্টি ভাগাভাগির পরও সি পি এম নেতৃত্ব তাকে বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে সম্মান জানাতে চেয়ে একবার বড়তলা আসনটি তাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বক্তব্য ছিল, সি পি আই-এর বিশিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী থাকতে তিনি এম এল এ আসনে কলকাতায় লড়বেন না। শেষ পর্যন্ত সোমনাথ লাহিড়ী ঢাকুরিয়া আসনে লড়েন।

সি পি আই-এর প্রাক্‌ভাতিন্দা লাইনের দুর্গতি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে যখন নির্বাচনে ভরাডুবি হল তখনও বিশ্বনাথ তার নিজের মাটিতে নিজেকে দৃঢ় রেখেছে।

বৃদ্ধ বয়সেও পার্টির অভ্যন্তরিন ঐক্য রাখার ব্যাপারে তার অবদান যে কি বিরাট তা বোঝা যায় তার মৃত্যুর পর। বিশ্বনাথ মানুষ হিসেবে যে কত বিশাল তা যারাই তার ঘনিষ্ট হয়েছে তারাই উপলব্ধি করেছেন।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত-এর

গ্রন্থ

উপন্যাস	একদিন একরাত, স্বপ্নভূমি
কবিতা	অন্য বনভূমি, ভালবাসা যখন প্রবাসে, এত প্রিয় এখন পৃথিবী, পর্বসন্ধি, স্বর্গ থেকে টেলিফোন
কাব্যনাটক	ঘর ও আকাশের গল্প
অনুবাদ	যদিও আমার হৃদয় গর্জমান (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সঙ্গে) বিংশতি কবিতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (রমাপ্রসাদ দে-র সঙ্গে)
প্রাপ্তিস্থান	কথা ও কাহিনী, দে বুক স্টোর

For quality Printing Please Contact

Basudev Printing Works

Dial 594223

অপরাহ্ণ

গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেলের রোদ তখন কমে এসেছে। কুয়াশার মতো পাতলা অন্ধকার এদিক ওদিক জুড়ে। সন্ধ্যেই এই মুহূর্তে শীতের হিম ভাব অনুভূতিতে আসে। কার্ত্তিকের শুরুতেই পশ্চিমের এদিকে হিম পড়তে শুরু করে, বাতাসে ঠাণ্ডাভাব অনুভব করা যায়।

পাকা সড়ক থেকে মোরাম দেওয়া রাস্তাটা সোজা ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে। দূরত্ব খুব বেশি না হলেও হেঁটে যেতে সময় লাগে। যানবাহন বলতে টাঙ্গা ভাড়া পাওয়া যায়, তবে সব সময় নয়। টাউনের দিকেই বেশি চলে, এদিকে বড় বেশি আসে না। গাড়ীর সঙ্গে ওদের সময় বাধা। ছোট্ট ষ্টেশন। দিনে তিনটের বেশি গাড়িও দাঁড়ায় না। নুড়ি পাথরের ওপর শব্দ ভুলে মোরাম দেওয়া রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা আসছিল। ঠুন ঠুন করে ঘন্টি যেন অকারণেই বাজছিল সকল নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে, ফাঁকা রাস্তায়।

গাড়ির অল্প দুলুনির মধ্যেই লতিকাদি একটু নড়েচড়ে বসলেন। হাতের বটুয়া থেকে একটা পান বের করে মুখে দিলেন, পাশের ছোট জানালা দিয়ে পিক ফেললেন রাস্তায়। বাঁ হাতে ঠোঁটের কষ মুছে নিলেন।

—কমলা, তোর মেজদা ঠিক আসবেন তো। গাড়ির অন্ধকারেও লতিকাদি কমলার চোখে চোখ রাখলেন।

—চিঠিতে তো তাই ছিলো, আজকের দিন ও তারিখ লেখা ছিলো। সুনয়নী, তোকে তো চিঠি দেখিয়েছিলাম, তোর মনে পড়ছে না? কমলা পাশে বসা সুনয়নীর দিকে তাকালো। সুনয়নী চুপ করে ছিল, পরে বললো কি জানি, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—দিদিমনিরা, ষ্টিশন এসে গেল। টাঙ্গাওয়ালার গলা শোনা গেল। বার দুই ঘন্টি বাজিয়ে গাড়িটা থেমে গেল। দরজা খুলে ওরা তিনজন নেমে এলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আরও ঘন হয়ে নেমেছে। ওরা তিনজন সিঁড়ি ভেঙ্গে

প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। সিগনাল ডাউন দিয়েছে। হয়তো মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি এসে পড়বে। অন্ধকার প্লাটফর্মের পাশের বঠগাছটায় পাখির কলরব সকল নিস্তব্ধতাকে সরিয়ে রেখেছে। চাপ চাপ কালো ধোঁয়া ছেড়ে ইঞ্জিনটা হঠাৎ করে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কামরার সঙ্গে কমলার চোখটাও অনেক দূর পর্যন্ত দ্রুত এগিয়ে গেল এবং পরে এক জায়গায় স্থির হল। গাড়িটা তখন দাঁড়িয়েছে। কমলা দল ছেড়ে এগিয়ে গেল। গাড়ির জানালা দরজায় ওর চোখ ফিরতে লাগল। সেজদা ঠিক এসেছে তাহলে—বলে কমলা দরজার সামনে এগিয়ে গেল। ধুতি পাঞ্জাবীতে একজন মাঝবয়সী প্রৌঢ় গাড়ি থেকে নামলেন। হাতে একটি সুটকেস। কমলা নিচু হয়ে প্রণাম করলো।

—দেখলি তো শেষ পর্যন্ত চলেই এলাম। ললিতমোহন মৃদু হাসলেন।

—আমি তো ভেবেছিলাম আসবেই না। গতবারে লিখেও শেষপর্যন্ত এলে না। চলো, আর দাঁড়িয়ে কথা নয়, ওরা ওখানে। টাঙ্গাও আছে।

ললিতমোহন হাঁটতে শুরু করলেন। কমলা মৃদুপায়ে হাঁটতে শুরু করলো। ষ্টেশনের কেরোসিনের আলোটা এরমধ্যে জেলে দিয়ে গেছে। গাড়ি থেকে আরও দু'চারজন দেহাতী লোক নেমে কিছু দূরে হাঁটছে। এরা বাইরের নয়। দেখে মনে হয় এখানকারই বাসিন্দা।

—তোদের এদিকে বেশ ঠাণ্ডা তো। ললিতমোহন গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। পশ্চিমে হিম ভাব তাড়াতাড়ি নামে। ওরা কারা? তোর সঙ্গে এসেছে বলেছিলি।

—ও, তোমাকে বলা হয়নি। আমার স্কুলের দুজন দিদিমনিও সঙ্গে এসেছে। ওরা ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। চলো, আলাপ করিয়ে দেবো।

কমলা আলাপ করিয়ে দিল। অন্ধকারে অল্প আলোয় সবার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তবুও ললিতমোহন সবার সঙ্গে সৌজন্যের নমস্কার বিনিময় করলেন। হাঁটতে হাঁটতে ওরা ওপরের রাস্তায় উঠে এলো। টাঙ্গাওয়ালা দাঁড়িয়েই ছিল, গাড়ির দরজা খুলে দিল। নুড়ি পাথরে শব্দ তুলে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে পার হয়ে রাত্রি নেমেছে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নার আলো ঝাপসা। কাঁচা রূপোলি আলো সমস্ত মাঠ প্রান্তর ছেয়ে আছে।

—মেজদা, ক'দিনের ছুটি নিয়েছো?

—বেশি নয়। আছে কয়েকদিন। দেখি, ভালো লাগলে থাকবো। তোর চিঠিতে বার বার আসার তাগিদ, তাই আসা।

—ভালো আপনার লাগবে। এখানে বেড়াবার বেশ কয়েকটি জায়গা আছে। লতিকা মুখ খুললেন।

—তবে তো ভালোই। হঠাৎ করে বেশ কিছুদিন সময় কাটানো যাবে। ললিত মোহন শব্দ করে মৃদু হাসলেন।

* * *

কমলা ললিতমোহনের নিজের বোন নয়। ললিতমোহনের মাসিমার মেয়ে। সেই ছোটবেলা থেকেই কমলা তাঁর বড় প্রিয় আর আদরের ললিতমোহন যখন বেশ দূরের জায়গায় স্কুলের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন সেই বছর কমলা স্কুলের গণ্ডি ছাড়ালো। তখন আর ঘন ঘন দেখা হোত না। হঠাৎ এসে পড়তেন কলকাতার বাড়িতে। বেশ কিছুদিন হৈ চৈ করে থেকে ফিরে যেতেন। কমলা দেখতে মোটামুটি সুন্দর ছিলো। মাসিমা বিয়ের জন্য পাত্রও দেখেছিলেন। কিন্তু কমলা রাজি নয়, বিয়ে মানেই হঠাৎ করে একটা বাঁধনে আটকে পড়া। সাংসারিক সার্থকতা থাকলেও অন্য কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হোল না। এরপর কমলাও চাকরী নিয়ে বাইয়ে চলে গেল।

গাড়ির গতি কমে এলো। মেজদা এবার নামতে হবে। আমরা এসে গেছি। কমলা যেন সবাইকে তাড়া দিল। লতিকা গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিল। দোরগোড়ায় একজন মাঝবয়সী মেয়ে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ির কাজের মেয়ে। আলোর পথ ধরে ওরা ভেতরে চলে এলো। ঘরে কাজের মেয়েটি আলো রেখে গেল।

কমলা বললো, এটা লতিকাদির ঘর মেজদা। এর পাশেরটা আমার আর দক্ষিণেরটা সুনয়নীর। বাইরে জল আছে হাত পা ধোও। তোমার শোয়ার ব্যবস্থা ওপরে হবে। মানদা, বাবুকে আর একটা আলো দে বাইরে।

মানদার সঙ্গে ওপরের ঘরে এলেন ললিতমোহন। দক্ষিণমুখী ঘর। বিছানাটি সাদা চাদরে সুন্দর করে ঢাকা। জানালার ধারে ছোট টেবিল। একটা

আরাম কেদারা। দেয়ালে সুন্দর ছবি টাঙানো ওয়াসিম কাপুরের আঁকা। দেখে খুশী হলেন ললিতমোহন। এঘরে এখন তিনি সম্পূর্ণ একা। অনেক্ষণ বাদে নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশ পেলেন। নিজেকে তৈরী করে নিচে নেমে হাতমুখ ধুলেন।

—আমরা এইঘরে মেজদা, এখানে চলে এসো।

ললিতমোহন ঘরে এসে বসলেন। সুনয়নী চা করে নিয়ে এলো। কমলা চা ঢেলে দিল। রেডিওতে খবর শুরু হয়েছে। গল্পে গল্পে রাত অনেক গড়িয়ে গেছে। রাতের খাওয়া শেষ করে ললিতমোহন যখন ওপরে এলেন তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আলোর শিখাটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। পায়ের কাছে রাখা চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন। একটু শীত করছে। হয়তো বয়সের লক্ষণ, ভাবলেন ললিতমোহন।

* * *

সকালে উঠে কমলাই সব গুছিয়ে নিলো। সবাইকে তাড়াতাড়ি বের হবার তাগাদা দিল। রবিবারের ছুটির দিনটা কোন ভাবেই যেন নষ্ট না হয়। দূরের চড়াই পার হয়ে পাহারের ধারে মন্দিরে যেতে হবে। অষ্টধাতুর দুর্গামূর্ত্তি আছে। ছুটির দিনে অনেকেই আসে পূজো দিতে এবং বেড়াতে। টাঙ্গা থেকে কিছু দূরে নেমে ওরা হাঁটাপথে এগিয়ে গেল। মানদা রইলো গাড়ির কাছে। খাওয়া দাওয়া এবং জিনিস পত্তরের তদারকি সবই ওর ওপরে। ললিতমোহন সকলের সঙ্গে বেশ পরিচিত আর অন্তরঙ্গ হয়েছেন। লতিকাকে দিদি বলে ডেকেছেন। আর সুনয়নী কমলার বয়সী, কিন্তু ওর আলাদা লাবণ্যে ওকে ছোট লাগে। ভালো লাগে দেখতে। কমলা আর লতিকা আগেই পূজা দিয়ে বের হয়ে এসেছে। রবিবারে ভিড় বেশি। পাহাড়ী পরিবেশে এই মন্দির যেন সমস্ত শুভ অশুভের চিহ্ন বহন করে চলেছে। ভিরের মধ্যে হঠাৎ সুনয়নীকে দেখতে পেয়ে ললিতমোহন আশ্বস্ত হলেন। ভিড়ে সবাই ছড়িয়ে পড়েছিল। ললিত মোহন কাউকেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সুনয়নী ললিতমোহনকে দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

—আপনার এখনও হয়নি। আমি ভেবেছিলাম আমি একা। লতিকাদি,

কমলা কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। ওরা বোধহয় পূজো দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে ভিড়ের মধ্যে ওরা দ্রুত এগিয়ে গেল। এক সময় ভিড় ঠেলে দুজনে বাইরে বের হয়ে এল। সুনয়নীকে বেশ পরিশ্রান্ত লাগছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে কপালের ওপর পড়ে থাকা চুল সরিয়ে দিল। বাইরে এসেও লতিকা কমলা ওদের কাউকে দেখা গেল না। ওরা দুজন হাঁটছিল। বেলা বেশ বেড়েছে। মাথার ওপর দিনের তাপ। শীত ভাবটা কেটে গেছে। দু'চারটে লোক এদিক ওদিক থেকে এখনও আসছে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা একটা ফাঁকা নিস্তব্ধতায় এসে পড়ল।

—চলুন, ওদিকে একটা ছোট্ট গুহা আছে দেখে যাবেন। সুনয়নী বললো। ভেতরে একটা মন্দিরও আছে। ললিতামোহন আপত্তি করলেন না। কি জানি, এখন হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে। ললিতমোহন এর মধ্যেই অনেক কথা জেনে নিলেন। এখানে এই পরিবেশে ওদের কতদিন কাটল। কেমন লাগছে এখানকার বাতাস। হালকা টিলা, পাহাড় ছড়ানো এই জায়গা খুব খারাপ নয়। একটা সুন্দর টান লক্ষ্য করা যায়। চলতে চলতে ওরা একটা উঁচু ঢিবির সামনে দাঁড়ালেন। মাটির কয়েকটা ধাপ ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। তায়পর কিছুটা সমতল। দূরে দাঁড়ালে কিছুই চোখে পড়ে না

—কতটা নামতে হবে। সিঁড়িগুলো জানেন। ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

—শুনেছি বেশি নয়, গোনা হয়নি কোনদিন। অথচ আমরা অনেকবার এসেছি। সুনয়নী যেন পরিহাস করল।

—এই গুহার মধ্যেও কি কোন মন্দির আছে নাকি, মানে এখানেও কোন দেবতা-টেবতা। ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

—তা তো আছেই। তবে কোন মূর্ত্তি নেই। উঁচু ঢিবির মত একটা বেদী আছে। অনেকে আসে, মানত করে এই আর কি। তবে বেশ রহস্য আছে, অন্ধকার, গা ছমছম ভাব।

গুহার সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ওরা নামছিল। অন্ধকারে চোখে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। পাশের দেয়ালের চুণ বালি খসে পড়েছে। বেশ পুরোন গুহা মন্দির এটা বোঝা যার। ললিতমোহন আগে আগে নামছিল, পিছনে সুনয়নী।

বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙ্গে একটা বাঁক নিলেন। পেছলে সুনয়নীর সিঁড়ি ভেঙে নামার চটির শব্দ বাজছিল।

—আপনি এর আগে এসেছিলেন, ললিতমোহন জিজ্ঞেস করলেন। ললিত মোহনের গলা এই ফাঁকা জায়গায় বেশ প্রতিধ্বনি তুলে বেজে উঠলো।

সুনয়নী শুনল। পরে বললো, লতিকাদি কমলা ওরা দুবার দেখে গেছে। আমার এই প্রথম। সুনয়নী নামছিল, ললিতমোহনের পাশে পাশে। ললিত মোহন একটু দাঁড়িয়ে চশমাটা ভালো করে মুছে নিলেন। ভেতরটা অন্ধকার পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই চলার মধ্যে ললিতমোহন একধরণের রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। তাঁর মনে হোল এই মুহূর্তে তিনি যেন সুনয়নীর অতি আপনজন। সুনয়নী হেন কতদিনের চেনা, অনেক পরিচিত কাছের মানুষ, ভাললাগার মানুষ। চমকে উঠলেন ললিতমোহন। এসব কি ভাবছেন তিনি।

সুনয়নীর গলার আঁচল গায়ে লাগছিল। সিঁড়িতে জায়গা কম. মাঝে মাঝে গায়ে গা ঠেকাঠেকি হচ্ছিল। একসময় এই গুহা যেন আরও অন্ধকারে ভরে গেল। নিচে নামার গভীরতা আরও বেশি। ওরা দুজনে কথা বলে চলছিল। হঠাৎ যেন চমকে উঠল সুনয়নী। অন্ধকারের চাপ ক্রমশ চোখের ওপর নেমে এলো। হাত কয়েকের মধ্যে আর যেন ললিতমোহনকে দেখতে পেল না সুনয়নী। শরীর মন একসঙ্গে চমকে উঠলো। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে হোঁচট খেলো, শরীর কেঁপে উঠলো ভয়ে। ললিতমোহনের কোন অস্তিত্বই চোখের সামনে নেই। সুনয়নী বিহ্বল ভয়ের মধ্যেই সুনয়নীর গলা বেজে উঠল।

—ললিতবাবু আপনি কোথায়? অন্ধকারে আমি কিছু দেখছি না, আপনি কোথায়—ললিতবাবু

সুনয়নীর গলা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো। সুনয়নী আবার ডাকলো, প্রতিধ্বনি ফিরে এল। সারা মুখে গলায় ঘাম জমে উঠেছে, শিরশির করে নামছে যেন। এবার সুনয়নী আবার ডাকতে গিয়েই সেই অসহায়তা আর ভয়ের মধ্যে ললিতমোহনকে সামনে পেয়ে আঁকড়ে ধরলো। মাথার ওপর ছোট্ট ঘুলি পথে আলো। ললিতমোহন স্থির। সুনয়নী যেন অনেক আশ্রয়ে আছে। বেশ

কিছুক্ষণ কেটে যেতে ললিতমোহন ডাকলেন, সুনয়নী চলো আমরা উপরে যাই। সুনয়নী চমকে উঠলো। ললিতমোহনের আশ্রয় থেকে সরে আসতে গিয়ে একটা বাঁধন অনুভব করলো, পরে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে সরে এলো। চোখের ওপরে বেশ উঁচুতে আলোর রেখা। ললিতমোহন সুনয়নীর হাত ধরলেন, সিঁড়ি টপকে উঠতে লাগলেন ওপরে। সুনয়নী চুপচাপ, সারা শরীরে একধরণের উষ্ণ রোমাঞ্চ তাকে অবশ করে রেখেছে।

বাড়ি ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। লতিকা কমলা আগেই ফিরে এসেছে। খাওয়া শেষ করে ললিতমোহন নিজের ঘরে ফিরে এলেন। গা শীত শীত করছিল। চাদরটা গায়ের ওপর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। একসময় চোখ বুজে এলো গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে ললিতমোহন ভাবলেন সুনয়নী আর তিনি পাহাড়ী রাস্তায় হেঁটে চলেছেন। দূরে গড়ানো পাহাড়ী রাস্তা যেন দিগন্তের শেষ সীমায় মিলেমিশে একাকার। চড়াই ভেঙে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছেন। স্বপ্নের ঘুমে যেন কথা বলছেন। সুনয়নী শুনছে, হাসছে উত্তর দিচ্ছে। গড়ানো পাহাড় শেষে হঠাৎ যেন আর পথ নেই। সুনয়নী হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে ছুটছে ললিতমোহন ডাকলেন। দূরে গভীর খাদ, আবার চীৎকার করে উঠলেন ললিতমোহন। সুনয়নী, সু-ন-য়-নী। সুনয়নীর শেষ শরীর তলিয়ে যাওয়ার মুখে ললিতমোহন জোড়ে ডাকতে গিয়ে গলার ঘড় ঘড় বুজে আসা শব্দে জেগে উঠলেন। সমস্ত শরীর এই হিম ভাবের মধ্যেও ঘামে ভিজে উঠেছে। বাইরে দিনের মরা রোদ। পাখি ডাকছে থেকে থেকে। অচেনা ডাক, বিষণ্ণ যেন। স্বপ্নের অনুভূতিতে ডুবে আছেন ললিতমোহন। উঠে বসতে কষ্ট হোল। শরীরে ব্যথা অনুভব করলেন। নিজের ওপর হঠাৎ একধরণের দুঃখে চুপসে গেলেন। পরিচিত বয়সটা মনে পড়ে গেল।

* * *

ভোরে উঠে কারো কথা শুনলেন না ললিতমোহন। সকালেও গতকালের সবকিছুই যেন কেমন বিবশ করে রেখেছে। কিছু আর ভালো লাগছিল না চায়ের টেবিলে সবাই গম্ভীর হয়ে বসেছিল। সুনয়নীকে দেখা গেল না। কমলা চা করে এগিয়ে দিল। ললিতমোহন তুলে নিলেন কাপ, এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলেন। সকলে চুপচাপ। সবাই কেমন গম্ভীর।

—তোমার পৌঁছতে তো বিকেল হয়ে যাবে। লতিকা জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, সন্ধ্যে তো বটেই, রাতও হতে পারে। ললিতমোহন উঠলেন। হাঁটতে হাঁটতে বাইরের বারান্দায় এলেন। আর কেউ নেই। দোরগোড়ায় সুনয়নী দাঁড়িয়ে, একা। চুপচাপ। মুখটা নিচু, তবু চোখের কোল ভারি মনে হোল। কাছে এলেন ললিতমোহন।

—আমি যাই সুনয়নী। তোমাদের বাসাবাড়ি, পাহাড়ী রাস্তা, গুহা মন্দির, এখানকার দিনে রাতের বাতাস সব মনে থাকবে। সুনয়নী কি বুঝল বোঝা গেল না। নিচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। গায়ের জামায় চোখের জলের দাগ লাগল। তোমাকে আমার আর দেওয়ার কিছুই নেই সুনয়নী। বড় দেরী হয়ে গেছে। আমরা দুজনেই সেই সময়টা পার হয়ে এসেছি। এখন নিঃস্ব, সবকিছু সাজানো কি আর এ বয়সে মানায়— না পারা যায়। গলা ধরে এলো ললিতমোহনের। সুনয়নী চুপ করে রইল, কান্না ভেজা গলায় বললো—

—একটা মনের খবর চিরদিন মনে থাকবে। এ বয়সেও যা নতুন করে কাছে এলো।

বাইরে টাঙ্গার ঘন্টি বাজলো। ললিতমোহন বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কমলা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। লতিকা দাঁড়িয়ে, চুপচাপ। একমনে উলের কাঁটা বুনে চলেছেন। একবার চারপাসে তাকালেন। ললিতমোহন গাড়িতে উঠে বসলেন। নুড়ি পাথরে শব্দ করে টাঙ্গা ছেড়ে দিল।

গিঁগড়েরা

সমীর কুমার রায়

বিদিশা ঠিক করে, ফোন করবে। খয়েরি রংয়ের ইনস্ট্রুমেন্ট। আগেরটা সাদা ছিল। আগরওয়ালাকে বলায়, সাদা পালটে খয়েরির ব্যবস্থা করেছে। আগরওয়ালার ওয়াইড কানেকশান আছে। অনেক হোমরা-চোমরা মানুষের সঙ্গে দহরম-মহরম। বড় বিজনেসম্যান। এই শহরের বেশ কয়েকটা হোটেলের মালিক। কোনটা স্বনামে, কোনটা বেনামে।

এই ফ্ল্যাটটা শহরের পাশ এলাকায়। আগরওয়ালারই। বিদিশাকে থাকতে দিয়েছে। থাকতে দিয়েছে? না, রেখে দিয়েছে? থাকতে দেওয়ার মধ্যে রেসিডেন্টের একটা স্বাধীকার বা স্বাধীনতার ভাব আছে না? রেখে দেওয়ার মধ্যে সেটা পাওয়া যায়? তাতে একটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে না?

ফোনের কাছে যায়। ইনস্ট্রুমেন্টে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ে, সে একসময় শিশু ছিল। বাবা বা মা ফোন ধরতে এলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতো। সে ফোন ধরবে। কিছুতেই তাদের ধরতে দেবেন না। বাবা হাসতেন। মা ধমক দিতেন। আবার কখনো কখনো বাবা বা মা কাছাকাছি না থাকলে ও গুটি গুটি পায়ে পায়ে রিসিভারের কাছে গিয়ে দাঁড়াত, কানে লাগিয়ে বলতো, 'হ্যালো' ঠিক যেমনটি বাবা করতেন। একটু পরেই বাবা বা মা কারো নজরে ঠিক পড়ে যেতো। মা কেড়ে নিতেন। ধমক বা কানমলা দিতেন।

ডায়াল করে। রং নাম্বারে যায়। 'সরি' বলে। রিসিভার রেখে দেয়। একটু পরে ফের ডায়াল করে। সেই একই নাম্বারে যায়। যে ভদ্রলোক আগেরবার ধরেছিলেন এবারও তিনিই ধরলেন। হয়তো কাছাকাছি বসে আছেন বা দাঁড়িয়ে। 'ফোনটা রেখে দিন। ঘন্টাখানেক বাদে ডায়াল করুন কারেক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন' ভদ্রলোকের কণ্ঠে বিরক্তি।

বিদিশা রিসিভার রেখে দেয় 'জ্ঞানদাতা' বলে। লম্বা ড্রইং-কাম-ড্রাইনিং। সিঙ্গল সোফা সীসে গিয়ে বসে। সেন্টার টেবিলের উপর দামী সিগারেটের প্যাকেট। ফরেন। লাইটারটাও পাশে। একটা সিগারেট ধরাল। মুখ ছুঁচলো

করে সামনের শূন্যতায় ধোঁয়া ছেড়ে। কয়েক সেকেণ্ড সামনের রঙীন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েকটা সেকেণ্ড। ব্ল্যাংক গেজিং। শূন্য দৃষ্টি।

স্বপ্নটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে কাল যাতে দেখা স্বপ্নের কথা। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে সে দাঁড়িয়ে। পর পর কয়েকজন সৈন্য তার দিকে বন্দুক তাক করে। লোডেড বন্দুক। সব কজন সৈন্যর মুখই হুবহু এক রকম। যেন একই মুখ আলাদা আলাদা কয়েকটা ধড়ের উপর বসান। এই মুখটা খুব চেনা চেনা ঠেকছিল। কোথায় যেন আগে দেখেছে। কিন্তু চিনতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল মনে করতে। তবু পারেনি। সেই স্বপ্নটার কথা এখন মনে আসে। অদ্ভুত স্বপ্ন। কেন দেখলো? মানুষ স্বপ্ন কেন দেখে? অবচেতন মনের ভাবনা-চিন্তা, উদ্বেগ, আশংকার প্রকাশ? তাই যদি হয়, তবে কি এরকম দুর্ভাবনা তার অবচেতন মনে লুকিয়ে ছিল? কাল রাতে স্বপ্নে কি তারই প্রকাশ ঘটেছে? অসম্ভব। এ হতে পারে না। সে তো কোনদিন ফায়ারিং স্কোয়াডের কথা মনেই আনেনি। তাহলে কেন এই ভাবনা তার মনের সাবকনশাস স্ট্র্যাটায় থাকবে? তার তো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াবার কোন সম্ভাবনাই নেই। মাতাহারিকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। বিদিশা মাতাহারি নয়। তার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কোন অভিযোগ নেই। সে গুপ্তচর নয়। তবে? তাহলে?

নতুন কেনা ফ্রিজের সেলার থেকে মদের বোতলটা বের করে। কয়েক ঢোক গলায় ঢালে। র। র হুইস্কি। বোতলটা সেন্টার টেবিলের উপর রাখে। সামান্য শব্দ হয়।

হোয়াট ইজ মোস্ট আনসার্টন ইন লাইফ? প্রশ্নটা মাথায় একটা ঠোক্কর দেয়। হোয়াট ইজ? প্যাকেটে এখন আটটা সিগারেট। দুটো ইতিমধ্যে ধ্বংস করেছে। টেন মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু এইট। কতদিন আগে ম্যাথ্যামেটিক্স শিখতো? টুয়েন্টি সিক্স মাইনাস? গত এপ্রিলে ও ছাব্বিশটা জন্মদিন পার করেছে। প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। খেতে থাকে। হোয়াট ইজ মোস্ট আনসার্টন ইন লাইফ। ইজ নট লাইফ ইটসেলফ?

অফিস থেকে বাবা ঠিক সময়েই ফিরেছিলেন। সচরাচর যে সময়ে ফিরতেন। মুখ হাত পা ধুয়ে চা খেতে বসেন। সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে। হঠাৎ বুকে হাত

দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েন। চায়ের কাপটা হাত থেকে পড়ে যায়। শব্দ হয়। টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙ্গে।

মা দ্রুত কাছে আসেন। 'কি হলো?'

বাবা হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছেন। মুখ কালো। যন্ত্রণার ছাপ।

বুক ব্যথা করছে? মা জিজ্ঞেস করেন।

বাবা কোনরকমে ঘাড় নাড়েন।

খুকু, ডক্টর সেনকে ফোন কর তো। মা বিদিশাকে বলেন।

ডক্টর অনিল সেন। ওদের ফ্যামেলি ফিজিশিয়ান। বিদিশা ডায়াল করল।

অনিল কাকা এসেই বললেন, হাসপাতালে এখনই রিমুভ করতে হবে। ব্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।

তিনদিনের মধ্যে বাবা মারা গেলেন। বিদিশারা বিপর্যয়ে পড়েছিল। মৃত্যুটা ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। ওরা কল্পনাও করেনি। গোটা পরিবারকে শোকমগ্ন করে ফেলে। কিন্তু বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার ব্যাপারটা থেকে যায়। শোক মানুষকে খেতে দেয় না। সংসারের অর্থ-নৈতিক দিকটা বাবা দেখতেন। মা কিছুই জানতেন না। বিদিশাও না। এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

রমেশকাকু বাবার বন্ধু ছিলেন। বন্ধু কে? বন্ধু কাকে বলে?

অফিস থেকে বাবার ডিউজগুলো তিনিই চেষ্টাচরিত্তির করে এনে দিয়েছিলেন। তিনি না থাকলে মা বা বিদিশার পক্ষে সম্ভব হতো? কখনোই নয়।

বৌদি, টাকাটা ব্যবসায়ে লাগান। মাকে বলেছিলেন। ব্যবসা? মা বলেছিলেন, আমিতো ব্যবসার কিছুই বুঝি না।

আমি তো আছি। আমি আপনাকে সাহায্য করবো। বসে বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। ব্যবসায়ে লক্ষ্মী।

মা ভাবলেন, বুঝিবা এটাই ঠিক পথ। রমেশবাবু যা বলেছেন তাই করা উচিত। তাঁরও তো নিজস্ব ব্যবসা আছে। ভালই চালাচ্ছেন। ব্যবসা বোঝেনও। মা গাছটাকে আঁকড়ে ধরলেন।

সিগারেট জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষিত হয়। এখন ফিলটারের অংশটুকু শুধু বাকি। মোটা কাঁচের অ্যাশট্রের মধ্যে বিদিশা তাকে আশ্রয় দেয়।

উর্মিলাকে না জানিয়েই বিদিশা রমেশকে চাকরির জন্য অ্যাপ্রোচ করেছিল। তাঁকে জানালে আসতে দিতেন না। রমেশের জন্য তাঁদের এই শোচনীয় অবস্থা এই ধারণা তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। সেই রমেশের কাছে হাত পাতা। বিদিশা তাই তাঁকে জানায়নি। বাস্তব তাকে প্র্যাকটিকাল হতে শিখিয়েছিল। প্রয়োজন হলে শত্রুর কাছেও হাসির মুখোশ পড়ে দাঁড়াতে হয়।

ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যেন না জানতে পারে। পাগল! একথা কাউকে বলা যায় নাকি! রমেশ একগাল হেসেছিলেন। হলদেটে দাঁতগুলো দেখা গিয়েছিল।

কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। হোটেলের এয়ারকন্ডিশানড্ ঘরে নেকেড হতে হতে বিদিশা রমেশের প্রতি ঘৃণা অনুভব করে। সেইসঙ্গে চরম অসহায়তাবোধে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে প্রায়। কিছু করার নেই। কোন উপায় নেই। এই লোকটা তবু তো তাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে রাজি হয়েছে। বিনিময়ে কিছু চায়। বিনিময়ের এই জিনিসটা না দিলে বিদিশা চাকরি পাবে না। অথচ চাকরি তার দরকার। এবং তা এখনই। না হলে বাড়িভাড়া দেওয়া যাবে না। তা না দিতে পারলে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। মা ও ছোটবোনকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। চাকরি না পেলে দুমুঠো চালও কেনা যাবে না। না খেতে পেয়ে মারা যেতে হবে। চাকরি তাই তার দরকার। এবং এখনই। এই লোকটা তাকে সেই চাকরি যোগার করে দেবে। বিনিময়ে তাকে এর সঙ্গে হোটেলের এই ঘরে এখন শুতে হবে। রাজি না হলে তাদের সোনা খেয়ে রাস্তায় সরতে হবে। আর কেউতো চাকরি জোগাড় করে দেয়নি। কম লোকের দরজায় তো ঘোরেনি। তবে? তাহলে? হোয়াট ইজ চ্যাস্টিটি? ইজ ইট হায়ার দ্যান লাইফ ইটসেলফ? বিদিশার তা মনে হয়নি।

ড্রেস আপ করে নেয়।

চলো। রমেশ বলেন।

রমেশের মোটরটা ঝকঝকে। দামী কেনা। এই পৃথিবীতে টাকাই একমাত্র সত্য। ওনলি মানি। আর কিছু নয়। সীটে হেলান দেওয়া দুচোখ বোজা বিদিশার তাই মনে হয়।

এটা আর একটা হোটেল। রমেশ গাড়ি পার্ক করেন।

এসো।

ঘরের বন্ধ দরজার উপরে লেখা 'ম্যানেজার'। সামনে টুলে বসে থাকা দারওয়ান দরজা খুলে দেয়।

চেয়ারে বসে থাকা লোকটার বয়স কত হবে? পঁয়তাল্লিশ? ছেচল্লিশ? মোটা, পুরু গোঁফ। মুখের চেহারায় নিষ্ঠুরতার ঈষৎ ছাপ না?

আরে, রমেশবাবু যে, আসুন, আসুন! সেই মুখ অমায়িক হাসিতে ভরে ওঠে।

রমেশ সামনের একটা চেয়ারে বসেন। বিদিশাকে দেখিয়ে বলেন, আগরওয়াল সাহেব, এই মেয়েটাকে আপনার হোটেলে একটা কাজ দিতে হবে।

আমার হোটেলে? আগরওয়ালের দুচোখ কোঁচকায়। বিদিশার দিকে তাকান।

জরিপ করা কাকে বলে? মাপা? আগরওয়ালের সাপের চোখের চাউনি কি বিদিশার দেহ জরিপ করে? বিদিশার গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

হোটেলে কি কাজ করবে? বিদিশার দেহ থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই আগরওয়াল রমেশকে জিজ্ঞেস করেন।

যে কোন কাজ। বড্ড কষ্টে পড়েছে। না খেয়ে মরার জোগাড়।

আগরওয়াল শব্দ করে হাসে। বিদিশা কোনদিন হায়েনার হাসি শোনেনি। মানুষ আর হায়েনা কি একই স্পেসির জন্তু। হায়েনার হাসি আর মানুষের হাসি একই?

ক্যাবারে ডান্স জানেন, ম্যাডাম? আগরওয়ালের প্রশ্নটা এবার বিদিশাকে।

বিদিশা কোনদিন ক্যাবারে ডান্স দেখেনি। শুনেছে। খারাপ নাচ। কুৎসিৎ। হতভম্ব হয়।

আমার হোটেলে আপনাকে ডান্সের কাজ দিতে পারি। মাসে মাসে মোটা মাইনে পাবেন।

বিদিশা বাসে বাড়ি ফেরে।

কোথায় গিয়েছিলি? এত রাত হোল? উর্মিলা জিজ্ঞেস করেন।

চাকরির খোঁজে। বাথরুমে যেতে যেতে বিদিশা উত্তর দেয়।

সার বেঁধে পিঁপড়েরা চলছে। শোয়ার ঘরের দরজার পাশ দিয়ে। শৃঙ্খলাবদ্ধ। একটার পর একটা। হোয়্যারটো? কোথায়? ফর হোয়্যাট পারপাস? কি উদ্দেশ্যে? বিদিশা মন দিয়ে দেখে। প্যাকেটের বেশ কয়েকটা সিগারেট খরচ হয়ে গেছে। বোতলটাও কিছুটা খালি। পিঁপড়েগুলো নিশ্চয়ই খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছে। কিম্বা সন্ধান পেয়েছে। সেখানেই দল বেঁধে যাচ্ছে। বিদিশা বোতল থেকে আবার কিছুটা মদ গলায় ঢালে।

ফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো!

বিদিশা!

বলো।

আজ রাতে স্পেশাল শো আছে। আটটায় গাড়ি যাবে, রেডি হয়ে থেকো।

আচ্ছা।

এই ফ্ল্যাটটা আগরওয়ালের নামে। কমল আগরওয়াল। নিঃসঙ্গী যুবতীকে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। নানান হ্যাপা পোয়াতে হতে পারে। কি দরকার। তাই আগরওয়াল নিজের নামে ভাড়া নিয়েছে। ব্লু-শাইন হোটেলের মানেজার কমল আগরওয়াল। তবে থাকে বিদিশা। একাকিনী। মা ছোট মেয়েকে নিয়ে সেই আগের বাড়িতেই থাকেন। ভাড়া আর বাকি নেই। মাসে মাসেই দিয়ে দেওয়া হয়। ছোট বোন কলেজে পড়ে। প্রতি মাসের গোড়ায় বিদিশা গিয়ে মাকে সংসার খরচের টাকা দিয়ে আসে।

তোর ফ্ল্যাটে কি আমরা থাকতে পারি না? মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

না, আমাদের ফার্মের নিয়মে পারো না। এই ফ্ল্যাট ফার্মের।

কি সব অনাসৃষ্টি নিয়ম।

বিদিশা কোন মন্তব্য করেনি। নিজের জিনিষপত্র প্যাক-আপ করে। কাল এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। কমল আগরওয়ালের ঠিক করা ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবে।

তোর অফিসের ঠিকানা কি? মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

জেনে তোমার লাভ কি?

যদি দরকার পড়ে কখনো।

পড়বে না। আমি এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাবো।

মা দুঃখিত হয়েছিলেন।

বিদিশা শোয়ার ঘরে যায়। খাটে শুয়ে পড়ে। দেয়ালে মেডেল হাতে কিশোরী বিদিশার ফটো। এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সে ফার্স্ট হয়েছিল। তারই মেডেল।

তুই কি হতে চাস মা? বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি খুব বড় গায়িকা হতে চাই বাবা। বিদিশা উত্তর দিয়েছিল।

আমাকে আপনি যদি বারে গান গাওয়ার কাজ দেন। বিদিশা আগরওয়ালাকে বলেছিল।

কি গান জানেন?

রবীন্দ্রসঙ্গীত, ক্লাসিকাল।

আগরওয়াল হো হো শব্দ করে হেসে উঠেছিল। ওসব গান আমার বারে চলে না ম্যাডাম। লোকে এখানে পয়সা খরচ করে আনন্দ পেতে আসে।

বাবার একটা ফটোও টাঙ্গান। আসার সময় নিয়ে এসেছিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বাবা ওকে খুব স্নেহ করতেন। মেয়ে যাতে তার স্বপ্ন পূর্ণ করতে পারে তার জন্য নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। উৎসাহ দিতেন। ভাগ্যিস মারা গিয়েছেন। সেই মেয়ে প্রায় নগ্ন হয়ে স্টেজে নাচে এ তাঁকে জেনে যেতে হয়নি। তিনি শুধু দেখে গিয়েছেন, বিদিশা পাড়ায় আর স্কুল-কলেজের ফাংশনের স্টেজে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর ক্লাসিকাল গাইছে, বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে, পুরস্কার পাচ্ছে। মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। চরমতম বেদনার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে।

বসো। আগরওয়াল বলে? বলে? না, নির্দেশ দেয়?

টেবিলের উপর বাঁ-হাতটা কনুই থেকে রেখে বিদিশা মুখোমুখি চেয়ারে বসে।

আজ একটা স্পেশাল শো আছে। সিলেক্টেড গেস্ট। ইব্রাহিম পার্টি দিচ্ছে। তোমাকে ড্যান্সের জন্য চুজ করেছে।

আমার চার্জ কত দেবে?

যা তোমার রেট।

বিদিশা আর্টিস্ট-রুমে গিয়ে বসে। প্রায় গোটা দেওয়াল জোড়া দামী কাঁচের আয়নায় প্রতিফলিত নিজেকে দেখে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি মুচড়ে ওঠে। আর্টিষ্ট? আয়নায় আর্টিষ্টের দেহ প্রতিফলিত। কি ধরণের আর্টিষ্ট? কিসের আর্টিষ্ট? কোন্ ধরনের ড্যান্স? সেটা কি আর্ট।

হাতের রিষ্টওয়াচে সময়টা দেখে। আটটা বেজে ত্রিশ মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড। আর্টিষ্ট রুমে দুটো টিউব লাইট। জ্বলছে।

ইব্রাহিমের পার্টি। ইব্রাহিম পার্টি দিচ্ছে। তার মানে আজকের রাতটা এই হোটেলের বার-রুম ইব্রাহিম ভাড়া নিয়েছে। সাট্টা ডন ইব্রাহিম। মাফিয়া ডন ইব্রাহিম। কি উপলক্ষ্যে তার পার্টি? কাদের সে পার্টিতে ইনভাইট করেছে? সাম আদার রাস্কেল্স্ অ্যাণ্ড স্কাউনড্রেল্স্কে।

ফোনটা বেজে ওঠে।

হ্যালো! বিদিশা ধরে।

রুম নম্বর তিন-এ যাও। ইব্রাহিম আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলবে। আগরওয়ালের গলা।

রুম নম্বর তিন দোতলায়। লিফট্ দিয়ে উঠেই বাঁ-দিকে।

আসুন ম্যাডাম! ইব্রাহিমের চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে। বিদিশা মুখোমুখি সোফা-সীসে বসে।

আজ আমি বহুৎ বড়া এক পার্টি দিচ্ছি। শহরের বেশ কয়েকজন খানদানি আদমিকে ইনভাইট করেছি। তা আপনাকে আমার ড্যান্সের রোলের জন্য মনে ধরলো। রাজি তো?

রাজি না হওয়ার কোন ব্যাপার নেই। এটা আমার প্রফেশান। কিন্তু কত দেবেন?

মিস বিদিশা, আপনাকে আমি দশ হাজার রুপেয়া দেবো। আপনি পার্টিকে শুধু জমিয়ে দিন। ব্যাস! আমি আর কিছু চাই না।

ক্যাশ অ্যাডভান্স দিতে হবে।

জরুর! জরুর! ষ্টেজে নামার আগে আপনি টাকাটা পাবেন। আমার লোক আপনাকে দিয়ে দেবে।

ইব্রাহিম পাইপে বড় করে টান দেয়। তারপর মুখ ছুঁচলো করে বিদিশার দিকে তাকায়। এই চাউনি, মুখের এই ভঙ্গিমা বিদিশার অতি পরিচিত। চেনা জানা। কত পুরুষ মানুষ এইভাবে তাকে দেখেছে, তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এ যেন তাকে জরিপ করা, জরিপ করে তারিফ করা। প্রথম প্রথম বড্ড অস্বস্তি হোত, ঘেন্না লাগত। এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে, অস্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। সময়ে সবকিছু সয়। ঘেন্না-পিত্তিও গলে জল হয়ে যায়।

এভরিথিং নোন্। চেনা জানা। কতগুলো লোক চেয়ারে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। সামনের টেবিলে দামী পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য। ইব্রাহিমকে কেউ চিপ্ল্স্ পার্টি বলতে পারবে না। ইলাহি ব্যাপার করেছে। মদ আর খাবারের ছড়াছড়ি। সব দামী। অতিথি আপ্যায়নে তার জুড়ি মেলা ভার। কিপটেমি করে না। দিলদরিয়া। তারপর একসময় এই হলঘরের উজ্জ্বল সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। শুধু খুব হালকা নীলচে আলোর বালবগুলো জ্বলে ওঠে। স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জোরে জোরে বাজনা বেজে ওঠে। ষ্টেজের উপর উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি এসে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত সেই আলো ষ্টেজের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্থির থাকে। তারপর চটুল পদক্ষেপে বিদিশা এসে দাঁড়ায়। শুরু হয় নাচ। নাচ? একে নাচ বলে? উদ্দাম ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করা, আর একে একে পরনের সব পোশাক খুলে ফেলা, পরিশেষে মৃদুতম আলোয় সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত তোলা। এ কোন নাচ? কোন ধরনের নাচ?

বেসিনের কলের জলে বিদিশা চোখ-মুখে ঝাপটা দেয়। তারপর তোয়ালে ভেজা মুখের উপর চেপে ধরে।

একটা সিগারেট ধরায়। ও এখন সোফায় বসে। পায়ের উপর পা। পরনে শালওয়ার কামিজ। ফোন বেজে ওঠে। বিদিশা বাজতে দেয়। বেজে থেমে যাক। এখন ও মানসিক ও দৈহিক দুদিক থেকেই ক্লান্ত। ফোন ধরতে ইচ্ছে করে না। কমল আগরওয়ালের পিওন এসে ঢোকে।

ম্যানেজার সাব আপনাকে ডাকছেন।

এবার তো যেতে হবে। আগরওয়ালের ডাক অগ্রাহ্য করা যায় না। করা

উচিত নয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল। নেওয়া যাবে না। আগরওয়াল-কে রাগান বিপজ্জনক।

মিস বিদিশা ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

আগরওয়ালের বিপরীত দিকে বসে থাকা লোকটি ঘার ঘুরিয়ে বিদিশার দিকে তাকায়। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসিটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

চিনতে পারছো?

বিদিশা চিনতে পারে। না পারার কোন কারণ নেই। একই পাড়ার ছেলে-মেয়ে। প্রায় সমবয়সী। বিদিশার থেকে বছর ছয়েকের মতন বড় হতে পারে। বিদিশাদের বাড়ির উল্টোদিকের রকে বসে সারাক্ষণ আড্ডা মারতো। ওকে দেখতে পেলেই সিটি দিতো, নানারকম অশ্লীল ইঙ্গিত করতো। একদিন বিদিশা টিউটোরিয়াল হোম থেকে পড়ে একা ফিরে আসছে। মোরের বকুল গাছটার সামনে দেখা। ছেলেটা ওর হাত ধরে টেনেছিল। আর তখনই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিদিশা তার গালে সজোরে চড় কষিয়ে দিয়েছিল। বাবা তখনও বেঁচে। সংসারটা ভুরবস্থার মধ্যে পড়েনি। ছেলেটা তারপর থেকে ওকে এড়িয়ে চলতো।

এ এখানে কি করে এলো? বা, সে এখানে আছে তাই-বা জানলো কি করে? তবে কি এ-ও ইব্রাহিমের দেওয়া পার্টিতে ছিল? ওর ক্যাবারে নাচ দেখেছে? খুব সম্ভবতঃ তাই। সেরকমই মনে হচ্ছে।

তোমার রেট কত? পার আওয়ার? ফের প্রশ্ন করে। এ কি সেদিনের চড়ের বদলা নিতে চায়? সেই অপমানের? বিদিশার আবার চড় মারতে ইচ্ছে করে। আবার চড়। কিন্তু মারে না। মারতে পারে না। আর মারার উপায় নেই। আগরওয়াল সামনেই বসে আছে। আগরওয়ালকে সে ভয় পায়। সে তার মুঠোর মধ্যে। আগরওয়ালার পে-রোলে সে আবদ্ধ। তার হাতে অনেক গুণ্ডা আছে। দরকার পড়লে তাদের ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

আজ আমি টায়ার্ড। কাল আসবেন, কথা হবে। বিদিশা বলে।

বেরিয়ে আসার সময় তার কানে উচ্চহাস্যের শব্দ ঠোক্কর মারে। বাড়ি ফেরার সারাটা পথ সেই হাসির শব্দ তাকে কুরে কুরে খায়। জ্বালায়। যন্ত্রণা দেয়। রক্তাক্ত করে। ল্যাচকি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলে। ভেতরে ঢোকে। হাতের

বটুয়াটা সোফায় ছুঁড়ে দেয়। তাতে অনেকগুলো টাকা আছে। ইব্রাহিম দিয়েছে। নাচের পারিশ্রমিক। দশ হাজার টাকা। ইব্রাহিমের কাছে টাকা খোলামকুচি। বিদিশার নগ্ন নৃত্যের জন্য কত অবলীলায় দশ হাজার টাকা উড়িয়ে দিল।

কাল আবার টাকা পাবে। যে ছেলেটাকে সে চড় মেরেছিল তার কাছ থেকে। রেট অনুযায়ী। যদি বিদিশা রাজি না হয়? ছেলেটা কিসের রেট জিজ্ঞেস করেছিল? নিশ্চয়ই ক্যাবারে ড্যান্সের নয়। সেই চড় মারার শোধ কাল সে নেবে। বিদিশা নিতে দেবে? যদি রাজি না হয়? আগরওয়াল আছে না। তার পোষা গুণ্ডারা রয়েছে না? সে জানে, খদ্দেরদের তৃপ্তির উপর হোটেলের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। বিদিশাকে খদ্দেরের অসন্তুষ্টি ঘটাতে দেবে।

ছেলেটার নাম কি যেন ছিল? স্মৃতিকে টানটান করার চেষ্টা করে। পেছনে নিয়ে যায়। হরিশ মুখার্জি রোড। তিনতলা বাড়ির ফুটপাথ সংলগ্ন একতলার বারান্দা। পাড়ার কয়েকজন বখাটে থেলের নিয়মিত আড্ডা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মনে পড়ে। বন্ধুরা তপ্না বলে ডাকতো। তার মানে নাম ছিল তপন। সে কি তাহলে এখন ইব্রাহিমের গ্যাংয়ে ভিরেছে? সাট্টা ডন ইব্রাহিম। মাফিয়া ডন ইব্রাহিম। এই সব বখাটে ছোঁড়াদের কাছে বিদিশা সেদিন সুদূরের নক্ষত্র ছিল। যাকে ধরা যায় না, কাছে আনা যায় না। শুধু তাকিয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত নয়নে। অসাধারণ সুন্দরী। স্মার্ট। সাহসিনী। পাড়ার ফাংশনে গান গায়। এইসব ছেলেদের বিদিশা পাত্তা দিত না, ধারে কাছে আসার সুযোগ দিত না। ঘৃণা করতো। সে তখন স্বপ্ন দেখতো, বিরাট এক নামকরা গায়িকা হবার। সারাদেশে খ্যাতি।

সেই তপ্নার সঙ্গে কাল দরদস্তুর হবে। নিজের রেট জানাবে। সে তো শুধু ক্যাবারে ড্যান্সার নয়, কলগার্ল ও বটে। তপ্না কলগার্ল হিসেবে তার রেট জানতে চায়।

ফোনের রিসিভারের দিকে তাকায়। তার প্রফেশানে ফোন খুব প্রয়োজনীয় কমল আগরওয়ালের মাধ্যমে খদ্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ। সেই কারণে মাঝে মাঝেই আগরওয়ালের ফোন আসে। সে-ই ফোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আচ্ছা, আগরওয়াল শুধু হোটেলের ম্যানেজার ? পিম্প নয় ? খদ্দেরদের সঙ্গে যে বিদিশার যোগাযোগ করে দেয় সে পিম্প ছাড়া আর কি ? হোয়াট এল.স্ ? সেই পিম্পের নির্দেশে কাল বিদিশাকে তপ্‌নার সঙ্গে বেড শেয়ার করতে যবে। যাকে সে একদিন হাত ধরার জন্য চড় মেরেছিল।

টেলিফোন ডায়াল করে।

ও-প্রান্ত থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, 'হ্যালো'।

গডেস অব মিউজিক আছেন ?

বলছি।

আমি বিদিশা। কাল সকাল সাতটায় আমার বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ।

আচ্ছা !

পজিটিভলি আসবেন কিন্তু।

হ্যাঁ, যাবো।

কাল ছাব্বিশে জুন। টুয়েন্টি সিক্সথ ডে অব জুন। পঁচিশ বছর আগে ছাব্বিশ জুন তারিখে সকাল সাতটায় বিদিশার জন্ম হয়েছিল। বাড়ির প্রথম সন্তান। আনন্দ উথলে উঠেছিল। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন হৈ হৈ করে উঠেছিল।

বিদিশা ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার পুরো দেহ প্রতিবিম্ব। আয়নার বিদিশাকে প্রশ্ন করে, এই দেহটাতেই তোমার একমাত্র মূল্য ?

আয়নার বিদিশা কোন উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। কেবল শোনে।

তুমিতো একদিন বিখ্যাত গায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে না ? বিদিশা ফের প্রশ্ন করে।

আয়নার বিদিশা শোনে। কোন কথা বলে না। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণায় একটুকরো বাঁকা হাসি ঝিলিক দেয়। শুধু বাঁকা ? বিষণ্ণ নয় ?

দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা শব্দ করে। এগোয়। সময় পার হয়।

ঢং ! ঢং ! ঢং ! পেণ্ডুলাম সাতবার শব্দ করে। গডেস অব মিউজিক ফ্ল্যাটের কলিংবেল টেপেন। বেশ কিছুক্ষণ। কেউ দরজা খুলে দেয় না। তিনি দরজায় একটা ঠেলা দেন। দরজা খুলে যায়। তার মানে ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। খোলা ছিল।

ভেতরে ঢোকেন। সার সার পিঁপড়ে। দরজা থেকে লাইন করে শোয়ার ঘরের দিকে চলেছে। পিঁপড়ের মিছিল। তাদের অনুসরণ করে গডেস অব মিউজিক শোয়ার ঘরে যান।

খাটে পাতা বিছানায় এক যুবতীর নগ্ন দেহ। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো বোজা। যেন ঘুমুচ্ছে। গভীর, প্রশান্ত ঘুম। অসাধারণ সুন্দরী। গডেস অব মিউজিক তাকিয়ে থাকেন। বেখেন। পিঁপড়েরা তার দেহের উপর হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। অনেক জায়গাতেই দগদগে ক্ষতর সৃষ্টি হয়েছে

গডেস অব মিউজিক তাকিয়ে থাকেন।

'আমাকে কেন নেমন্তন্ন করেছিলে ?'

শায়িতা যুবতী কোন উত্তর দেয় না। ঠোঁট ফাঁকও হয়না। সাইড টেবিলে রাখা কাঁচের গ্লাশে তলানি জল। পাশে অনেকগুলো স্লিপিং ট্যাবলেটের ঢাকনি। গডস অব মিউজিক তাকিয়ে থাকেন।